# বর্ত্তমান কর্ম্মযগ

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এ, প্রণীত

প্রকাশক

ভাষা-পরিষৎ লিমিটেড্

২৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা

মূল্য ।৵৹ আনা

প্রকাশক
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি,
২৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।
বাণী প্রেস,
১২।১ নং চোরবাগান লেন, কলিকাতা

# উৎসর্গ

যিনি
ধর্ম্ম, যিনি স্বর্গ,
যিনিই
জীবনের পরম তপস্যা,
যাঁহার
হৃদয় হইতে এই হৃদয়ের সম্ভব,
যাঁহার
অঙ্গ হইতে এই অঙ্গের উদ্ভব,
যাঁহাকে
শৈশবে হারা হইয়া বাত্যা-বিতাড়িত
কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় সংসার-সাগরে,
ভাসিতেছিলাম,
যিনি
আমাদের শৈশবের শত শত অপরাধ
ক্ষমা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন,
ভূতলে প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ,
স্বর্গীয় সেই পিতার
শ্রীচরণ কমল যুগলে এই গ্রন্থ
অর্পণ করিলাম।

# ভূমিকা

বর্ত্তমান কর্ম্মযুগ লেখার পর এক যুগ চলিয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে অনেক ওলট্ পালট্ হইয়াছে। যাহা ছিল, তাহা আর নাই। যাহা ছিল না, তাহাই আসিয়াছে। যাহা আসিয়াছে, তাহাও চলিয়া যাইতেছে।

এই দ্রুত পরিবর্ত্তনের মধ্যে, অনেকই আসিল, অনেকই গেল—গেল না শুধু জগতের দারিদ্র্য—থামিল না অদৃষ্টচক্রের নিষ্পেষণ এবং দরিদ্রের দলন—আর ফিরিল না শুধু ভারতের ভাগ্য-চক্র !!

ঘাট অঘাট হইল, অঘাট্ ঘাট হইল। কত হাট বসিল, কতই বা ভাঙ্গিল! ভাঙ্গিল না শুধু ভোগের হাট—যেখানেই বসিল, সেই খানেই শ্মশান হইল—সেই খানেই আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! যে আগুনে, সে দিন ইউরোপ পুড়িয়া ছারখার হইয়াছে, সে আগুন এখনও নিভে নাই—আবার কখন জ্বলিয়া উঠিবে, কে বলিতে পারে!

এত বড় একটা প্রকাণ্ড নরমেধ—এত বড় একটা যজ্ঞ—যেই যজ্ঞে লক্ষ লক্ষ নরকপালে রক্তপান করিয়াও, সমর-রাক্ষস তাহার শোণিত-লালসা পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই!! আবার যেই শোণিত-তর্পণের নিমিত্ত কতকগুলি দুর্দ্ধর্ষ জাতি পরস্পর প্রতি-যোগিতার সহিত অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উঠিতেছে! আবার উহাদের তাণ্ডবে পৃথিবী কম্পিতা হইবে! আবার ঐ ছলনায় লক্ষ লক্ষ নির্ব্বোধ মানব উহাদিগের পশ্চাতে পশ্চাতে গড্ডালিকার ন্যায় মৃত্যুমুখে ধাবিত হইবে! আবার ঐ ভীষণ অনলে, লক্ষ লক্ষ প্রাণ পতঙ্গের ন্যায় পুড়িয়া মরিবে!

এ রণ সজ্জা কিসের জন্য ? আবার একটা পৃথিবীব্যাপী মহা-সমর হইবে—সেই জন্য নয় কি ? আবার কুচ-কাওয়াজের চোটে জগৎটাকে তোলপাড় ক'রে তুলবে, সঙ্গিন্ তলোয়ারের ছটায় বিদ্যুৎ ছুটাবে, সখের সেনা সেজে, মরণের খেলা খেলবে—লোককে বলে বেড়াবে—যুদ্ধ, ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য—আর করে বেড়াবে, ঘাতকের কার্য্য—দলবদ্ধ, সভ্য, শিক্ষিত নরহন্তাগণের কি নিষ্ঠুর, কি নৃশংস অনুষ্ঠান !! সেই জন্যই কি এত সাজাসাজি, গাজাগাজি- এযে প্রলয় সজ্জা !!

রে নৃশংস নিষ্ঠুর মানবজন্ম ! ও কিসের সজ্জা— ভাইকে মারিবে ? সে ত বুক পাতিয়াই আছে—এই বিষাক্ত ছুরিকা লও—চুপে চুপে ঐ নক্ষত্র-শূন্য গভীর নৈশ অন্ধকারের নিম্নে তোমার নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান কর—জগতকে উহা জানিতে দিওনা—তোমার কর্ম্ম তুমিই কর, তুমিই দেখ—আর কেহ যেন উহা না করে—কেহ যেন উহা দেখিতে না পায় ! তোমার পাপ তোমার স্কন্ধেই চাপুক, পৃথিবীর বক্ষে উহা নিক্ষেপ করিও না। War—যুদ্ধ, বা কর্ত্তব্য কার্য্য—এই সকল মিথ্যা নাম দিয়া উহার নৃশংসতা ঢাকিতে চেষ্টা করিও না। যতই বলনা কেন, যাহাই বুঝাও না কেন, মানুষ-মারা ছাড়া, আর উহা কিছুই নহে। অর্থ-রাজ্য-ক্ষমতা-যশ-লুব্ধ কতিপয় শঠের ছলনায় জগৎ শুদ্ধ নরবলি !! মুষ্টিমেয় লোকের রাজনৈতিক কুহকে লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর নির্ব্বোধের রণক্ষেত্রে তাণ্ডব নৃত্য—কিসের জন্য ? মানুষ মারিয়া মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা - সেই জন্য !! সেই মানুষ কে ? একই ঔরসে, একই গর্ভে জন্ম—

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয় সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্মমহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃপিতা ।

হে কুন্তীনন্দন, স্থাবর জঙ্গমাত্মক যে সকল জীব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উদ্ভূত হয়, প্রকৃতি তাহাদের মাতৃস্থানীয়া, এবং আমি তাহাদের বীজ-প্রদ পিতা।

শুধু মানুষ কেন? সমস্ত জীব জগতের সহিত মৈত্রী বা ভ্রাতৃত্ব ভাবে মানুষ সম্বন্ধ। সেই মানুষ আজ ভ্রাতৃপ্রেম বিসর্জ্জন দিয়া, মৃৎ পিণ্ড লইয়া সমরে প্রবৃত্ত—সেই পবিত্র উদার ভাব সম্যক বিস্মৃত। সভ্য বলিয়া অহঙ্কার—নিষ্ঠুর বর্ব্বরের ব্যবহার! দেশে দেশে দ্বেষদ্বন্দ, জাতিতে জাতিতে ভেদ কলহ, মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি—কে কাহাকে মারিয়া খাইবে—কে কাহাকে লুটিয়া নিবে—কিছুরই নিশ্চয়তা নাই—

সভ্য বলি করে দম্ভ অহঙ্কার,
নাহি দয়াধর্ম্ম সত্য সদাচার।
যে যাহারে পারে সে তাহারে মারে—
ঘাত, অপঘাত, আরো কহি কত!

বীর ব্রত বলি করে অহঙ্কার,
প্রচণ্ড ঘাতক, যুগ-অবতার,
জগত জুড়িয়া পায়রে সম্মান,
ধন্য ধন্য বলি হইছে পূজিত!

বায়ু উল্কা বলে করে আবিষ্কার,
কিসে লক্ষ প্রাণ করিবে সংহার—
একিরে বিজ্ঞান সত্যের সন্ধান?
একিরে সভ্যতা সত্য-ধর্ম্ম পথ?

একে খেটে মরে, পরে লুটে খায়,
আপনি না খায় কুক্কুরে বিলায়—
তথাপি তাহার এত অপরাধ—
পাইতে পারেনা কুক্কুরের ভাগ !

সুগন্ধ সুন্দর সুরস মধুর,
সুখের যা কিছু, কিছু নহে তার,
জগতের সুধা সকলি একের—
অপরের শুধু টেনে মরা সার !

গলিত পিষিত উচ্ছিষ্ঠ আহার
যদি ভাগ্যে মিলে, ভাগ্য মানি তার !
কারো স্বর্ণ থালে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন,
কারো অনশন, ভিক্ষায় জীবন ।

একের বিনাশে অন্যের উল্লাস,
একের রুধিরে অন্যের বিলাস,
উদরান্ন তরে পশুর সংগ্রাম—
কে বলে মানব সৃষ্টির প্রধান !

ইহাই বর্ত্তমান কর্ম্মযুগের নিখুঁত ছবি—সভ্যতাভিমানী এই নরাসুর গুলির চরিত্রের অকপট চিত্র ! ইহাই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বিজয় বৈজয়ন্তী !!

কতবড় ধৃষ্টতা—জগতে ইহারাই আবার দয়াধর্ম্মের মিশন্ লইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া থাকে ! ইহারাই আবার ব্রাহ্মণকে সাম্য মৈত্রী—Equality, Fratérnity—শিখাইতে আসে ! নিজের ঘরের

সামাল নাই, পরের ঘরের খুঁটী নিয়া নাড়ানাড়ি! এই Equality, Fraternity—শুধু বামুনের হেঁসেল মার্‌বার বেলায়—লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের বুকে বসিয়া, রক্ত চুষিবার সময় সাম্য-মৈত্রী—সব ছুটে যায়—তখন আর দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞান থাকে না—

"একের বিনাশে অন্যের উল্লাস,
একের রুধিরে অন্যের বিলাস—

এই যদি হয়, শিক্ষা সভ্যতার চরম উদ্দেশ্য, সে শিক্ষা সে সভ্যতা রসাতলে যাক্‌। ভারত সে সভ্যতা চাহেনা! ব্রাহ্মণ কখনও বর্ব্বরের সেই আদর্শ গ্রহণ করিবেনা। ইতি—

সন ১৩২৮
১৫ই জ্যৈষ্ঠ } গ্রন্থকার।

# সূচী

# বর্ত্তমান কর্ম্মযুগ

—:-(*)-:—

( ১ )

## অবতরণিকা

বিজাতীয় কর্ম্মতাণ্ডবে আসমুদ্র হিমালয় আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে। কর্ম্মদানবের ভীষণতাণ্ডবে সনাতন-ধর্ম্ম-মন্দির-মুকুট খসিয়া পড়িয়াছে। বর্ণাশ্রম বিধ্বস্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় অন্তর্ধান করিয়াছে, ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব স্বীকার করিয়াছে, আর্য্যজাতি শিশ্নোদর পরায়ণ হইয়া পড়িয়াছে। আর্য্য-কীর্ত্তি, আর্য্য-গৌরব, আর্য্য-যশ, আর্য্য-বিভব, আর্য্য-তেজ, আর্য্য-বীর্য্য, হায়, সকলই বিলুপ্ত হইল। দেখিতে দেখিতে কি ঘোর নাস্তিকতা আসিয়া ভারত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ ব্যাপিয়া জড়ের উপাসনা ও জড়শক্তির ভীষণ-স্রোত প্রবহমান। ক্ষিত্যপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম্,—এই ভূতপঞ্চক আশ্রয় করিয়া জড়বাদী সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড করতল করিতে উদ্যত; সমুদ্র শাসিবে, পৃথিবী গ্রাসিবে, সুমেরু কুমেরুর চিরনীহার-কুজ্ঝটীকা ভেদ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের আদ্যন্ত নির্দ্ধার করিবে। অতল সমুদ্রতলে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনার বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করিবে। ভূগর্ভ বিদার করিয়া বসুন্ধরার গুপ্তভাণ্ডারের ধনরত্ন-রাশি লুণ্ঠন করিবে। অত্যুচ্চ হিমাদ্রি শৃঙ্গে অমরাবতী স্থাপন পূর্ব্বক, স্বর্গেরও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ বিলাস

আত্মসাৎ করিয়া, দেবতারও মনে ত্রাস জন্মাইয়া দিবে। মরুভূমি—নন্দনে, নন্দন—মরুভূমিতে পরিণত করিবে। স্বকপোল-কল্পিত জটীল যন্ত্র সহকারে সৌরজগতস্থ অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের তথ্য আবিষ্করণ-পূর্ব্বক আপনার অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত-উপলব্ধি জগতে প্রচার করিয়া মনুষ্যবুদ্ধি কলুষিত করিবে। যেন এজগতে কাহারও কিছু বলিবার ছিল না, কেহ কিছু বলে নাই, আর, কাহারও কিছু বলিবার নাই। কাহারও যেন আর কোন অধিকার নাই!

নাস্তিক শূদ্র বেদাধিকারী হইবে। অপৌরুষেয় অনাদি অনন্ত বেদ সান্ত বলিয়া স্পর্দ্ধা সহকারে, জগৎ সমক্ষে প্রচার করিয়া, জীবের মুক্তির পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিবে; ঋষিবাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিবে; পরলোকে অবিশ্বাস জন্মাইবে; পিতৃপুরুষকে অপমান করিবে, গুরু-বেদবাক্যে অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিবে; গো-ব্রাহ্মণ হিংসা করিবে, মন্ত্রদ্রষ্টা ত্রিকালদর্শী গুরু-ঋষি-বংশ-সম্ভূত ব্রাহ্মণকে পদানত করিয়া, আপনাকে উপদেষ্টার আসনে উপবেশন করাইবে। আর্য্য জাতিকে উপহাস করিয়া, আপনাকে আর্য্য বলিয়া অহঙ্কার এবং আর্য্য বলিয়া জগতে প্রচার—কি আশ্চর্য্য !!

অয়ি ইতিবৃত্ত কথা,
ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ।
ওগো মিথ্যাময়ি
তোমার লিখন পরে
বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজ জয়ী।"

অপরের ধর্ম্মের নিন্দাবাদ দ্বারা স্বকীয় ধর্ম্মের যাজনা, লোক সংগ্রহের এই আসুর-পদ্ধতি, মহাতীর্থযাত্রী কোটী কোটী মুমুক্ষুজীবকে পথভ্রান্ত করতঃ অজস্র অশুভ নরকে প্রেরণ করিতেছে।

"প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ।"

(গীতা)

উগ্রকর্ম্মী পাশ্চাত্য জাতিসমূহই এই অত্যুৎকট কর্ম্মের অভিনেতা; প্রাচ্যদিঙমণ্ডল ইহাদের সাধারণ লীলাভূমি; ভারতক্ষেত্র, ইহাদের প্রমোদ মঞ্চ।

শক, হুন্ হইতে আরম্ভ করিয়া পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্যজাতিসমূহ যখন শ্যেন-দৃষ্টিতে, দূর হইতে সুষুপ্তি-বিভোরা এই মৃতকল্পজাতিকে শবপ্রায় সন্দর্শন করিয়া, একে একে ভারত-পৃষ্ঠে অবতরণ পূর্ব্বক, ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিতেছিল, তখনও এই গভীর সুষুপ্তি-মগ্ন মৃতপ্রায় দেহে চেতনার অনুভূতি হয় নাই। কর্ম্মদানবের উগ্রতাণ্ডব তখনও ইহার গভীর সুষুপ্তি ভঙ্গ করিতে পারে নাই! সুপ্তসিংহ তখনও ইহাকে মুষিকের ক্রীড়াকৌতুক বলিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ঝঞ্ঝাবাত আসিয়া এই সকল শক্তিগুলিকে একটি মহাশক্তিতে মিলাইয়া দিল! শতশাখা শতহ্রদা যেন বজ্রঝনৎকারে ভারত-বক্ষে ভীষণ বেগে আপতিত হইল! ভারত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

আজ আবার ভারতের সে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছে। পিতৃপুরুষের কত কোটী জন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে তাঁহাদের সন্তানসন্ততিতে স্বধর্ম্মবুদ্ধি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ঐ বীর শিশুকুল "বেদান্ উদ্ধরতে" বলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে।

বেদের উদ্ধার হইবে। ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিবে। ক্ষত্রিয় জন্মিবে। বর্ণাশ্রম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদানাত্মনম্ সৃজাম্যহং॥

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগেযুগে ॥

তোমার অমৃতময়ী বাণী,
'পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
হে ভগবন্।"
এই অধঃপতিত জাতির বিদগ্ধ হৃদয়ের
বিপুল বাসনা—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
হে ভগবন্।

"কর্ম্মযোগিন্," এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ। তোমারই জয়স্তুতি গান, তোমারই মহিমা কীর্ত্তন, তোমারই প্রোক্ত সনাতন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও প্রচার তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। তোমারই প্রেরণায় তাহার মানসপটে অতীত-গৌরব-স্মৃতি জাগরুক হইয়া উঠিয়াছে,—সেই অতীত গৌরব দিনে, অত্যুচ্চ হিমাদ্রিশৃঙ্গে, যখন একদিন কর্ম্মের বিষাণ মুখরিত হইয়া সমগ্র জগতকে প্লাবিত করিয়াছিল, জ্ঞানসূর্য্য যাহার প্রথম গগনে উদ্দীপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ অসভ্য বর্ব্বর জাতির তামস-মুখমণ্ডল আলোকিত করিয়া তুলিতেছিল, সে দিনকার ইতিহাসে,—সেই অনাদি অনন্ত অপৌরুষেয় আর্য্যকীর্ত্তি গ্রন্থে,—এই পর-পদানত জাতিরই জ্ঞান-গরিমা গীত হইতেছে। আত্ম-বিস্মৃত অধঃপতিত এই আর্য্য জাতিই সমগ্র জগতকে সেই একদিন কর্ম্মযোগে দীক্ষিত করিয়াছিল। "কর্ম্মযোগিন্" আবার সেই অতীত গৌরব-গাথা ভারতীয় আর্য্যের প্রতি ঘরে ঘরে গাহিয়া বেড়াইবে।

# ( ২ )

## পাশ্চাত্যের কর্ম্মতাণ্ডব

স্বকীয়-শিল্প-চাতুর্য্য-প্রচার-পটীয়সী-পাশ্চাত্য সভ্যতা বর্ত্তমান কর্ম্মযুগে অগ্রণী বলিয়াই মনে হয়। কালের কষ্টিপাথরে বাজারদর কষিয়া লইবার পূর্ব্বেই, উহার শিল্প-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-পদ্ধতি, সোণারদরে ভারতের বাজারে বিক্রীত হইতে লাগিল! কাঞ্চনবিনিময়ে ভারত যে কাজ গ্রহণ করিল, তাহা তখনও বুঝিতে পারে নাই। আর্য্যজাতি যে আত্মবিক্রীত হইল, কালের কোষ্ঠিতে তাহা ধীরে ধীরে ফলিয়া উঠিল।

পাশ্চত্যের অদ্যম উদ্যম, দুর্নিবার অধ্যবসায়, অত্যধিক সাহস, বল, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, সকলই যে ভারতবাসীর মঙ্গল ঈক্ষণে ঝলসিয়া উঠিয়াছে, তাহা অদুরদর্শী প্রাচ্য দেশীয়গণ চার্ব্বাক-চক্ষে দেখিতে না না পাইয়া, ঐ অপহৃত রশ্মিকেই অমৃত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু কাল-চক্রের আবর্ত্তনে উহা যে ঘোর অমাবস্যায় পরিণত হইবে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না! ঐ অত্যুৎকট কর্ম্ম-স্রোত আশার শত শত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া, যে দিগ-দিগন্তে ধাবিত হইতেছে, উহার পল্বল-শয্যা যে একদিন ভীষণ মরুভূমিতে পরিণত হইবে, তাহা না বুঝিতে পারিয়া, অস্মদ দেশীয়গণ 'আগে চল,' 'আগে চল' রবে ঐ স্রোতের মুখে গা ঢালিয়া দিয়া আপনাকে পাশ্চত্যের বরপুত্র এবং প্রাচ্যের মুখপাত্র জ্ঞানে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছে!

শূন্যবাদী আর্য্যেতর জাতির এ আদর্শ হইতে পারে! আর্য্যের তো এ আদর্শ নয়! মনুষ্যের মধ্যে যাহারা মনু, দেবতার মধ্যে যাহারা বাসব, ঋষির মধ্যে যাহরা কপিল, কবির মধ্যে যাহারা

ভার্গব, শস্ত্রধারীর মধ্যে যাহারা রাম, যোগীর মধ্যে যাহারা শঙ্কর, ছন্দের মধ্যে যাহারা গায়ত্রী, শব্দের মধ্যে যাহারা ওঙ্কার, ব্রহ্মাণ্ডের যাহারা ব্রাহ্মণ, তাহাদের তো এ আদর্শ নয় !! তবু যেন, কি একটা এই আর্য্যজাতির স্কন্ধে ভুতের ন্যায় চাপিয়া বসিয়া উহার মতি-গতি ফিরাইয়া দিল। স্বদেশ স্বধর্ম্ম হায়, সকলি ডুবিল !

মহামায়ার কি যেন কেমন একটা দুরন্ত মায়া, এক এক সময় এক একটা জাতিকে একেবারে পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলে ; তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিদ্যাবুদ্ধি, সব মুছিয়া ফেলিয়া একবারে অলস ও অবশ করিয়া দেয় ! এই আর্য্যজাতির ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল ! আর্য্যের সে উদার ভাব, আচার, ব্যবহার, যেন পলকে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল ! সকলই পাশ্চাত্যের ছাঁচে ঢালিবার জন্য উৎসুক হইল—চাকর—বেয়ারা সাজিল, শ্রীযুত—মিষ্টার সাজিলেন ; বাল্মিকী—হোমার, ও কালিদাস—সেকস্‌পিয়ার সাজিলেন ; বাইবেল বেদ হইল।

"যাহা নাই বিলাতে,
তাহা নাই ভারতে"

দিন কয়েকের মধ্যে এ জাতির ধ্যান ধারণা ঐ রূপেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল ! রামায়ণ মহাভারত—মিথ্ (myth) হইল। বেদ—ইতিহাসের সীমা ছাড়াইয়া গেল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের শ্যেন-দৃষ্টিতে বেদের আদ্যন্ত নির্দ্ধারিত হইল। ব্রাহ্মণের কুলকোষ্ঠী প্রস্তুত হইল। তাহার আদিম বাসস্থান আবিষ্কৃত হইল ! জ্ঞাতি গোষ্ঠী সব জুটিল। পিতৃব্য-কুলে শিক্ষিত হইয়া আর্য্যপুত্রগণ "চপ্‌-কাট্‌লেট্‌, শেরি-শাম্পেনে" পিতৃলোককে আহ্বান করিতে লাগিলেন। জল আশা পিণ্ড আশা বিলুপ্ত হইল। পিতৃগণ অন্তর্ধান করিলেন।

"পতন্তি পিতরো হ্যেষাং
লুপ্ত-পিণ্ডোদক ক্রিয়াঃ।" (গীতা)

নিরয়ভয়ে পিতৃলোক ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছেন! প্রেতগণ পিণ্ডজল প্রত্যাশায় অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে! বস্তুতঃ ভারতের ভাগ্যে কি ঘোর দুর্দ্দৈব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আর্য্য সন্তান, আপনার ধর্ম্ম-কর্ম্ম মান-সম্ভ্রম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক, উন্মত্তবৎ নগ্নদেহে পাশ্চাত্য সভ্যতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান। ঐ অবিদ্যাস্পর্শ মাত্রেই যে দ্বিগুণতর দাহের কারণ হইয়া উঠে, তাহারা উহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছে না। প্রকৃত পক্ষে, উহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল পূতিগন্ধময় মল-মূত্র-ক্লেদে, পরিপূর্ণ। উহাতে বস্তুতঃ আকর্ষণের কোন সামগ্রীই বিদ্যমান নাই।

বেশী দিনের কথা নয়, দিনকতপূর্ব্বে, পৃথিবীর একপ্রান্তে উৎকট রাজসিক এবং তামসিকশক্তি আশ্রয় করিয়া একটী জনতার আবির্ভাব হয়; উহারা মাতৃকুক্ষি হইতেই উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া পৃথিবী আক্রমণ অভিলাষে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে। এবং মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সমগ্র জীব-জগতকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে। উহাদের শাণিত কৃপাণতলে নিরাশ্রয় অসভ্য এবং অর্দ্ধসভ্য বহুতর জাতিকে ভূতলে মস্তক অবনত করিতে হইয়াছে। পশ্চিম ভারতের আদিম-নিবাসীগণ ইহাদিগের হস্তে কতকোটী জন্মের কর্ম্মফল ভোগ করিয়াছে, আরও যে কত করিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই!!

কতকোটী নিরাশ্রয় হতভাগ্যের রক্তে ইহাদিগের আমোদ মদিরা প্রস্তুত হইতেছে। কতকোটী নিরাশ্রয় হতভাগ্যের মাংসপেশী দ্রুতগামী স্যন্দন-নেমী শোভা করিয়া ইহাদের প্রমোদ বিহার, ২, সুন্দর এবং দ্রুততর করিয়া তুলিয়াছে। কত কোটী জীব আপনাদের শিক্ষা-দীক্ষা-মোক্ষ ভুলিয়া ইহাদিগের বিলাস-শিল্প-ভবনে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, শুধু

উদরান্নের তরে জীবনপাত করিতেছে। স্বচ্ছন্দ-বন-বিহারী মৃগযুথ. কোমল-শ্যামল-শস্যক্ষেত্রে অবাধ-বিচরণে আর সে শান্তিভোগ করিতে পায়না। বলাকার দুগ্ধফেননিভ সুচিক্কণ পালক মহিলার শিরস্ত্রাণ শোভা করিয়া বেড়াইতেছে। উন্মুক্ত-গগন-বিহারী নভশ্চর বর্ত্তুল-প্রহারে ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। আশীবিষ আপনার জীবন্ত নির্ম্মোক দ্বারা, কুলাঙ্গণার মণিবন্ধ আচ্ছাদন করিয়া, কৃতার্থ বোধ করিতেছে। সমুদ্র-মন্থনকারী-পোত-চক্র-প্রহারে মকর, কুম্ভীরাদি জলচরগণ অতলতলে ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। সৃষ্টির প্রথম হইতে যে নীরব নির্জ্জনভূখণ্ডে জীবহিংসা-পটীয়সী মনুষ্য-লালসা স্বকীয় জিঘাংসা-নির্ঘোষ বিজ্ঞাপন করিবার অবকাশ পায় নাই, আজ হয়ত তথায় অশীতিবর্ষবয়স্ক অজারপৃষ্ঠে আগ্নেয়-বর্ত্তুল অকস্মাৎ বিনিপতিত হইয়া, তাহার করুণ আর্ত্তনাদে তত্রত্য তপোবনের শান্তি ভঙ্গ করিয়া দিল। অহো! 'এই উগ্রকর্ম্মীগণ জগতের প্রভূত অমঙ্গল সাধন নিমিত্তই যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। হায়! কোন্ ভাগ্যদোষে ধর্ম্মক্ষেত্র কর্ম্মক্ষেত্র ভারতক্ষেত্র ইহাদের ক্রীড়াভূমি হইল? সৃষ্টির আদ্যন্তকাল স্থায়া ত্রিকালদর্শী এই আর্য্য-জাতির সহিত পাশ্চাত্য-সংঘর্ষ কেনই বা সংঘটিত হইল?

হয়ত, সনাতনধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইবে, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এক হইবে, না হয়, সমগ্র ম্লেচ্ছজগতকে বর্ণাশ্রমের দ্বারে আজীবন ক্রীতদাস থাকিয়া আর্য্যত্ব শিক্ষা করিতে হইবে। বেদ-বেদান্তবাদী এই আর্য্যজাতিই জগতে ধর্ম্মরাজ বলিয়া স্বীকৃত হইবে। বেদ বেদান্ত-প্রসূত এই সনাতন ধর্ম্মই জগতে সম্রাট বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইবে। সনাতন-ধর্ম্মবিলোপী দুরন্ত কলির সহস্রবৎসর দারুণ-প্রয়াস কটাক্ষে ব্যর্থ করিয়া, ঐ মহাপুরুষ জাগ্রত হইলে, সহস্র বৎসরব্যাপী ঘোর অন্ধকার পলকে দূরীভূত হইবে।

উগ্রকর্ম্মপরায়ণ বলদৃপ্ত মোগল পাঠানগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া একদিন কি না করিয়াছে? দেবমন্দির বিধ্বস্ত করিয়াছে, বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে, রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে, জাতিধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়াছে। ভাবিয়াছিল, আর্য্যনাম লোপ করিয়া ভারতকে যবনাভিধানে পরিণত করিবে। অনাদ্যনন্ত কাল-ব্যাপী একটা জাতির কঠোর সাধনা বলপূর্ব্বক উৎখাত করিয়া ফেলা—ব্রহ্মাণ্ডমূলস্পর্শী হিমাদ্রি-শিখর আমূল উৎপাটিত করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করা—সহজসাধ্য নহে। যাহা সত্য, যাহা সনাতন, তাহা থাকে—চিরকাল! এই জাতি স্বপ্নদর্শনের ন্যায় পলকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কত সন্দর্শন করিয়াছে। কীট পতঙ্গাদির ন্যায় কত জাতির উত্থান, কত জাতির পতন, ইহার মঙ্গল কটাক্ষে সংসাধিত হইয়াছে। ইহার ঐশ্বর্য্য-ছায়ায় কত দেশ, কত জনপদ, সুখশান্তি ভোগ করিয়াছে। ইহার পান্থশালায় কত পথিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সংগ্রহ করিয়া জগতকে বিতরণ করিয়াছে। ব্রাহ্মণের সেই কঠোর তপশ্চর্য্যা, ক্ষত্রিয়ের সেই বিপুল সাধনা, কি কখন বিনষ্ট হইতে পারে? তবে যে দুরন্ত মায়া ভারতে প্রবেশ পূর্ব্বক মুষিকের ন্যায় বর্ণাশ্রম ভিত্তি খনন করিয়া ফেলিতেছে, উহাকে অপসারিত করিতে হইলে, আবার সেই ব্রহ্মতেজের প্রয়োজন। ব্রহ্মতেজ ব্যতীত ঐ দুরন্ত মায়ার সম্মুখীন হওয়া অসম্ভব।

( ৩ )

## যক্ষের ধন

পাশ্চাত্যজাতি যক্ষের ধন পাইয়া বড় মানুষ হইয়াছে। কোটী কোটী বৎসর যাহা বসুন্ধরার গর্ভে সুরক্ষিত হইয়া আসিতেছিল, পাশ্চাত্য পলকে তাহা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কলম্বস্ স্বপ্নাদেশে জানিতে পারিয়াছিল, দূরে মহাসমুদ্রগর্ভে রত্নখনি মহাদেশ লুক্কায়িত রহিয়াছে। তাই উহারা সহস্র সহস্র যোজন দূর হইতে, নন্দন-মন্দার-গন্ধে লুব্ধ হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল, এবং ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ইন্দ্রের অমরা আত্মসাৎ করিল। নন্দন ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইল। ত্রিভুবন-লক্ষ্মী অলক্ষিতে হরণ করিয়া নিল! তাই মা আমার আজ বৃক্ষমূলে নিরানন্দা—

মলিনাম্বরসম্বিতাং রাক্ষসিভিঃ সমাবৃতাং।
উপবাস কৃশাং দীনাং নিশ্বসন্তীং পুনঃ পুনঃ॥

রামভক্ত দেখিতে পাইলেন, মা আমার দুরন্ত রাক্ষসী প্রহরিণী কর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা। মলিনাম্বর পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, এবং মুহুর্ম্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। প্রতিপচ্চন্দ্রলেখার ন্যায় অনশনে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছেন।

"সীদন্তি শুক্লপক্ষাদৌ চন্দ্রলেখামিবাবিলাং।"

"এই কি মা আমার?"—এই ভাবিয়া ভক্তের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। মা আমার ধূমজালসমাচ্ছন্না অনলাশিখার ন্যায় পীতবর্ণ জীর্ণ একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছেন।

সপঙ্কামনলঙ্কারাং বিপদ্মামিব পদ্মিনীং

অলঙ্কার শূন্যা, কমলদল বিরহিতা মলিনা কমলিনীর ন্যায় শ্রীহীনা হইয়াও শোভা পাইতেছেন।

"অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনাং"

মায়ের নয়ন-যুগল অজস্র অশ্রুধারা পরিপ্লুতা ; মা আমার—

কৃশামনশনেন চ"

অনশনে মা আমার অস্থিকঙ্কালমালিনী হইয়া পড়িয়াছেন।

যক্ষসুরক্ষিত কুবের ভাণ্ডার শূন্যপ্রায় হইয়া গেল ; প্রাচ্য ডুবিল ; পাশ্চাত্য স্ফীত হইয়া উঠিল। উহার সসাগরা পৃথিবী গ্রাস করিবার চেষ্টা রাক্ষসের অত্যুৎকট তপস্যাকেও পরাস্ত করিয়াছে। অসুরের আসুর-পরাক্রম-উহার নিকট হার মানিয়াছে। অযুত বাষ্পীয় রথচক্রের অজস্র ঘর্ঘরে দুর্ব্বল-দরিদ্র অদৃষ্টচক্রে অর্দ্ধনিষ্পেষিত ; বিপুল জনতা ভয়ে ও বিস্ময়ে দূরে দণ্ডায়মান। অদূরে মর্ম্মস্পর্শীসভ্যতার মর্ম্মর-মন্দির—সম্মুখে বিপুল জনসঙ্ঘ ক্ষুধার্ত্ত। মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবী তুষার-ধবল অঙ্গুলী সঙ্কেত দ্বারা তাঁহার বিলাস্-শিল্পভবন দেখাইয়া বলিল— "ঐ তোমার শিক্ষা, দীক্ষা, জন্ম ও মৃত্যু। বুভুক্ষা রাক্ষসী প্রাতঃ-রাশের জন্য আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র নির্দ্দিষ্ট জীব উহার আহারের জন্য প্রস্তুত হইল এবং ধীরে ধীরে উহার মুখ বিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল। অর্দ্ধজীর্ণ গজভুক্ত কপিত্থ দিবসের শেষে পরিত্যক্ত হইল। উর্দ্ধস্রোতা তিমির ন্যায় কখনও এই দুর্ব্বল জন-প্রবাহকে আকর্ষণ, কখনও বা উদ্গীরণ করিয়া, উৎকট-আসুরীশক্তি ভূমণ্ডলে এইরূপ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে।

ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠনকরিয়া, পাশ্চাত্য সম্পাদমদ-মত্তত্বায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। কত দেশ. কত জনপদ, কত জাতি ধর্ম্ম-অর্থ-কাম লইয়া উহাদিগের ঐ প্রচণ্ড বাসনা-বহ্নিতে পুড়িয়া মরিল!

উপপ্লবায় লোকানাং ধুমকেতোরিবোত্থিতঃ।"

ধ্বংসের-নিশান ধুমকেতু উঠিয়াছে। হব্য-কব্য-বাহী যজ্ঞীয়-বেদী নরশোণিত-লোলুপ ধূম-গর্ভ-লৌহ-নালীকের সিংহাসনে, বিষ্ণুপাদ-পীঠ বধ্যভূমিতে পরিণত হইয়াছে। জগৎ জুড়িয়া চীৎকার উঠিয়াছে, 'এক হও, বড় হও।" "বড়" হইতে পারিলে বাঁচিবে, নচেৎ দেশ, ধর্ম্ম, জাতি, সর্ব্বশুদ্ধ মরিয়া যাইবে! এই "বড় হওয়াটা"—হয়ত পাশ্চাত্যের Progess বা Evolution ; march of an insect race of people towards an unkown or unknowable goal. "এই বড় হওয়ার মানে হয়ত, স্বদেশ-জাত পণ্য সস্তায় ভবের হাটে বিক্রয় করা। যে যত সস্তায় স্বীয় পণ্য বিক্রয় করিতে পারিবে সে তত "বড়" হইবে। সেই বাঁচিয়া থাকিবে। ইহাই আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের মীমাংসা! ইহাই নাকি, আবার Survival of the fittest." ইহাকেত আমরা পশুর সংগ্রাম বলিয়া থাকি—Struggle for existence ত পশুর জীবন সংগ্রাম! দুইদল কুকুরের গলিত আমিষখণ্ড লইয়া কলহ।

বোধ হয়, এই দার্শনিক তথ্যবলেই গ্রীস রোম একবার ঐ রকমের "বড়" হইয়া উঠিয়াছিল। উহারা যে চিরদিনের জন্য "বড়" থাকিবে না, একথা কি উহারা কখনও ভাবে নাই! অবশেষে বর্ব্বরের ব্রজমুষ্টিতে উহার সমুন্নত সুসভ্যদেহ ভূলুণ্ঠিত হইল। উহারাও এক দিন বসুন্ধরার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া সদর্পে 'veni vedi veci' বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছিল। মৃত্যু সে দর্প গ্রাস করিয়াছে। সে বলদৃপ্ত জাতি কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে। ভারতের সহিত বৈশ্য-সংঘর্ষে আসিয়া কতশত জাতি বড় হইল, কত ছোট হইল, কত কি হইল। বৈদেশিক ম্লেচ্ছ-বৈশ্যগণ যখন বিলাতের বাজারে

আর্য্য-শিল্পজাত পণ্য সাদরে বিক্রয় করিয়া বেড়াইত, এবং ম্লেচ্ছ কুলমহিলাগণ সগর্ব্বে উহা ধারণ করিত, তখনও এই "বেচা কেনার" ভাবটা পাশ্চাত্য জাতিগুলিকে ভূতের ন্যায় পাইয়া বসে নাই; অতি অল্প সময়ের মধ্যে সভ্যতার জোয়ারে উহারা এতটা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। স্বীকার করি, উহাদের শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যের নিকট ভারত মস্তক অবনত করিয়াছে। মানিলাম, আট্‌লান্‌টীকের মহোচ্ছ্বাসে ভারত ভূমি আপ্লাবিত হইয়াছে। কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা এখনও ডুবিয়া যায় নাই। এখনও ভারতের চিরন্তনগৌরব-গরিমার অমল ধবল হাস্যরাশিরূপে ধবলগিরি বিরাজমান।

( ৪ )

## টাকার গরম

যক্ষের ধন হজম করা যায় না—এই যে জনশ্রুতি, ইহার মূলে নিগূঢ় সত্য নিহিত আছে। উহা গ্রহণ করিলে, বংশ থাকে না—এই ভয়ে, কেহ উহা গ্রহণ করিতে চায় না। শৈশবে ঠাকুরমার নিকট গল্প শুনিতাম, এই মাটীর নীচে অনেক টাকা কড়ি লুকান আছে। যাহার সৌভাগ্য থাকে, সেই উহা পায়। রাত্রে স্বপ্নযোগে যক্ষ আসিয়া তাহাকে উহার সন্ধান বলিয়া যায়। শনিবারে, মঙ্গলবারে, অমাবস্যায়, ঘোর সন্ধ্যার সময়, কিংবা নিশি-শেষে কখন কি করিয়া, কি বেশে, কোথায় যক্ষের সন্ধানে যাইতে হইবে, সে সকল খবরও যক্ষ দিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ঠাকুরমার গল্প একটা মনে পড়ে,—এক যে ছিল বুড়ি, তার ছিল সাত ছেলে। খুব যোয়ান, যোয়ান। বেশ দুপয়সা উপায় করে। খায়, দায়, সুখে থাকে। বেশ সুখেই বুড়ীর দিন যায়। একদিন শেষরাত্রে কে যেন তা'কে এসে ডাক্‌লে—দেখ, আমি সাত রাজার ধন,—অমুকখানে আছি। আমাকে তুলে নে। কিন্তু তোর সাত ছেলের একটা ছেলেকে দিতে হবে। প্রতি রাত্রেই যক্ষ বুড়িকে এসে তাগাদা করে। বুড়ি ভুল্‌বার নয়। খুব চতুর। অর্থের উষ্ণতার বিষয়ে তার বেশ অভিজ্ঞতা আছে। সে ভাব্‌লো যে আমার ছেলেরা কেন অত টাকার গরম সইতে পারবে। "দুর্ দুর্" করিয়া বৃদ্ধা সম্মার্জ্জনী হস্তে, যক্ষকে তাড়া করিল। যক্ষও বৃদ্ধার সম্মার্জ্জনী-সৎকৃত হইয়া উহার উঠান্ হইতে সরিয়া পড়িল। তথাপি যক্ষ মাঝে মাঝে বৃদ্ধাকে খোসামুদ্ করিতে ছাড়িত না।

এই বৃদ্ধার নাম শ্রুতি, বর্ণাশ্রম উহার সন্তান সন্ততি। মায়ের ন্যায় হিতৈষিণী শ্রুতি সর্ব্বদাই সন্তানের মঙ্গল কামনা করিতেছেন।

এইরূপে যক্ষ বর্ণাশ্রমের দ্বার হইতে বিতাড়িত হইয়া দেহান্তর জিঘৃক্ষু প্রেতযোনির ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাশ্চাত্যের স্কন্ধে চাপিয়া বসিল। পাশ্চাত্য ঐ ঘুর্ণায়মান প্রেতযোনির আবেশে ইতস্ততঃ ছুটাছুটী আরম্ভ করিল। উহার উগ্রতাণ্ডবে লোকত্রয় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। এই তাণ্ডবের এক নাম পাশ্চাত্যের অর্থনীতি। উহার অপর নাম কর্ম্মচাণ্ডাল—এই কর্ম্ম-চাণ্ডাল অসূয়া-পরবশ খল এবং কৃতঘ্ন।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই প্রবচন খুবই সত্য। আমরা কখনও অর্থনীতির বিরুদ্ধবাদী নহি। আর্য্যজাতি অর্থনীতির বিরুদ্ধ-বাদী নহে। আর্য্যজাতি যে কোন দিন অর্থসঞ্চয়-পরাঙ্মুখ ছিল, তাহাও নহে। "সওদাগরের-সাত-ডিঙ্গা" বোঝাই হইয়া যখন দেশ দেশান্তরে ভারতীয় পণ্য বিক্রয় করিয়া বেড়াইত, তখন ইউরোপীয়গণ ঐ সকল বাণিজ্যপোত সন্দর্শনে, আফ্রিকার উপকূলে নির্ব্বোধ কাফ্রিদিগের ন্যায় বিস্ময় বিহ্বল নেত্রে তাকাইয়া থাকিত। বিলাতের বন্দরে যখন ভারত বিনির্ম্মিত জাহাজ উপস্থিত হইল, তখন কে না জানে যে, বিলাতের বাজারে কি ভীষণ হুলস্থুল ও হাহাকার উঠিয়াছিল। যখন ভারতীয় সওদাগরের সপ্তডিঙ্গা সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইয়া, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইত, তখন উহারা এই পাশ্চাত্য অর্থনীতি জানিত না বলিয়াই বোধহয়, উহাদের অর্থের উত্তাপে পৃথিবী দগ্ধ হইতে পারে নাই, এবং বিশ্বব্যাপী একটা ভীষণ হাহাকারও উঠে নাই।

বাজার পসরার অন্তরালে রাজসিংহাসন লুক্কায়িত রাখিয়া, দেশে দেশে স্বকীয় পণ্যপসরা কি করিয়া যাচাই করিতে হয়, তাহা

উহারা জানিত না বলিয়াই বোধ হয়, উহাদের প্রতি পদক্ষেপে তুমুল কুরুক্ষেত্র সংঘটিত হয় নাই। free-trade নামক দুষ্ট অপদেবতাও যেখানে সেখানে জোর করিয়া treaty port খুলিয়া বসিতে পারে নাই। আর্য্য বৈশ্যগণকে বর্ণাশ্রমের অধীন থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইত। বর্ণাশ্রমানুমোদিত বৈশ্য-নীতি উহাদিগকে প্রতিপালন করিতে হইত। উহারা এই কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে অন্যায়রূপে অর্থ সঞ্চয় করিয়া অন্যায় ভোগ বিলাসের অধিকার পাইত না।

ধর্ম্মের অবিরোধে অর্থচিন্তা, ধর্ম্ম ও অর্থের অবিরোধে কামচিন্তা, ইহাই সদাচার। এই তিনের মধ্যে কাহারও দৃষ্ট বা অদৃষ্ট রূপে হানি না হয়, এই জন্য ত্রিবর্গের প্রতি সমদৃষ্টি রাখিয়া, আর্য্য জাতির ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি সংযত করিতে হইত। কিন্তু যবন প্রাধান্যতার প্রারম্ভ হইতে ভারতের সে বর্ণাশ্রমানুশাসন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। জাতি আদর্শ-ভ্রষ্ট হইয়াছে। এখন এই দুষ্টা লক্ষ্মী (যক্ষের ধন) জীবনের একমাত্র উপাস্য দেবতা। জীবনও শুধু ভোগ বিলাসের নিমিত্ত। এইরূপে জাতীয় জীবন দ্বারা যক্ষের পূজা সম্পাদিত হইতেছে, উপধর্ম্ম সত্যধর্ম্মকে গ্রাস করিতেছে। মূঢ়গণ বুঝিতে পারে না যে যে অর্থই অনর্থের মূল এবং অনন্ত দুঃখের নিদান। এই অর্থ উৎসাহবহুল, অনন্ত মনোরথ-সম্পন্ন, অতীব আকুলতা পরিপূর্ণ, অনেক মূর্খকে পরিচালিত করে, এবং এই অর্থলিপ্সা হইতে বহুতর কুচিন্তার উৎপত্তি হয়। ইহা দুষ্ট চেষ্টায় ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠে। দুগ্ধ যেমন সর্পের বেগ বৰ্দ্ধিত করে, সেইরূপ যে যে কার্য্যে দোষাবেগ বৃদ্ধি পায়, সেই সেই কার্য্যে ইহা বিস্তার প্রাপ্ত হয়। ইহার বৃদ্ধি সুখের হেতু নহে, দুঃখেরই মূল। ইহাকে রক্ষিত করিলে

সুরক্ষিতা বিষলতার ন্যায় ভবিষ্যতে ইহা বিনাশের কারণই হইয়া থাকে। এই লক্ষ্মী ভয়-ভ্রান্তিরূপ পেচক বৃন্দের গহন-গুহা। খেদের নিদান এবং বিষাদ বৃদ্ধির মূল। ইন্দ্র-ধনুর ন্যায় অচিরস্থায়ী এবং বিবিধরাগে রঞ্জিত। বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল, উৎপত্তি মাত্রেই বিনাশশীল এবং জড় আশ্রয় করিয়া অবস্থিতা। এই লক্ষ্মী সাহস লভ্যা এবং ক্ষণ-ভঙ্গুরা। প্রতারণা পটুতায় দারুণ মরীচিকাও ইহার নিকট পরাজিত। সর্পবেষ্টিতা কুসুম-লতিকার ন্যায় মনোরম এই লক্ষ্মী মনোবৃত্তির উপর প্রভুত্ব করিতে থাকে।

রণজিৎসিংহকে কোন সাধু বলিয়াছিলেন,, তুমি বহুরণ জয় করিয়া রণ-জিৎ হইয়াছ বটে, কিন্তু যদি মনোজিৎ হইতে পারিতে অর্থাৎ মনকে জয় করিতে পারিতে, তাহা হইলে তোমাকে প্রকৃত জয়ী মনে করিতাম। বস্তুতঃ বহুরণ জয় করিলেও জয়ী হওয়া যায় না! মনকে জয় করিতে পারিলেই, প্রকৃত পক্ষে জয়ী হইতে পারা যায়। যাহারা অর্থ-বলে পৃথিবী জয় করিতে চায়, তাহারা ভ্রান্ত! পক্ষান্তরে অর্থই তাহাদিগকে জয় করিয়া থাকে। অর্থদ্বারা “সাপের পা” ও “বাঘের দুধ” কত নাকি অসম্ভব, সম্ভব হয়! ধনবলদৃপ্ত চিত্ত এইরূপ অহঙ্কারেই মত্ত হইয়া থাকে। অর্থের প্রভাবে যাহা সম্পাদিত হয়, সে তাহা স্বকীয় প্রভাব বলিয়া জ্ঞান করে। অর্থের সহিত আমিত্ব, মনুষ্যত্ব বা বীরত্বের যে কোন রূপ সম্বন্ধই নাই, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না! আজ যে ধন আছে, কাল উহা থাকিবে না! লক্ষ্মী সরিয়া গেলেই সর্ব্বশূন্যা দরিদ্রতা আসিয়া গ্রাস করিবে। একথা তাহারা সম্পদ-মদ-মত্ততায় ভুলিয়া যায়। অর্থের উত্তাপ যে পর্য্যন্ত থাকে, সে পর্য্যন্ত উঁহারা ধরাকে সরার ন্যায় জ্ঞান করে। কোটরস্থিত উগ্রানল মানবকে জীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় দগ্ধ করিয়া অবশেষে চলিয়া যায়। এইরূপ একদিন ফরাসী রাক্ষসকে ওয়াটারলু

গ্রাস করিল। হতভাগ্য সিরাজ হতশ্রী হইয়া ঘাতকের হস্তে নিহত হইল। ব্রহ্মদৈত্য নন্দকুমার এখনও শূন্যে শূন্যে কাঁদিয়া বেড়ায় !!

## কর্ম্ম-চাণ্ডাল

রাহু ভারত-ধর্ম্ম-মণ্ডল গ্রাস করিয়াছে। কর্ম্ম-চাণ্ডাল সংস্পর্শে ধর্ম্মক্ষেত্র অপবিত্র হইয়াছে। কর্ম্ম-ভূমি হইতে বিষ্ণুপূজার অধিকার-উঠিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

কেহ "ত্রাহি ত্রাহি" বলিয়া বেগে জাহ্নবী সলিলে নিপতিত হইতেছে। কেহ বা ভীতি-গদগদ কণ্ঠে রাহুকে স্তব করিতেছে।

উত্তিষ্ঠ গম্যতাম্ রাহো ত্যজ্যতাম্ সূর্য্যসঙ্গমং।
কর্ম্মচাণ্ডাল যোগোত্থম্ কুরু পাপক্ষয়ম্ মম॥

হে রাহো! তুমি সূর্য্যসঙ্গম পরিত্যাগ কর। কর্ম্ম চাণ্ডাল সংস্পর্শজ পাপ আমার ক্ষয় হউক।

কেহ বা উক্ত মন্ত্র উচ্চাচরণ পূর্ব্বক গ্রহণাবসান কালের অপেক্ষা করিতেছে। এই গ্রহণ ত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত, ধর্ম্ম গোলকের উজ্জ্বল ছটা আর দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাশিত হইবে না। গ্রহণ ক্ষয় না হইলে, কর্ম্মভূমি বিষ্ণুপূজার অধিকার আর ফিরিয়া পাইবে না। এই কর্ম্মচাণ্ডাল সংস্পর্শজযোগে প্রতিগ্রহপরায়ণ ব্রাহ্মণ চণ্ডালবৎ হইয়াছে। দীর্ঘরোষ ছিন্নমুণ্ড রাহু কখনও সূর্য্যমণ্ডল কখনও চন্দ্র মণ্ডল আক্রমণ করতঃ শূন্যপথে পরিভ্রমণ করিতেছে, এবং কখনও অর্দ্ধগ্রাস কখনও পূর্ণগ্রাস করিয়া লোক সমূহকে ব্যথিত করিতেছে। সূর্য্যই লোকচক্ষু রূপে এবং চন্দ্রমা সর্ব্বভূতে অন্তরাত্মারূপে বিরাজ করেন। উহারা উৎপীড়িত হইলে লোক সমূহ উৎপীড়িত হয়। সেই অন্তরাত্মা বিজাতীয় শক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে স্বধর্ম্ম বুদ্ধি লোপ পায়, বুদ্ধিলোপ হইলে ধর্ম্মে উপধর্ম্ম, উপধর্ম্মে ধর্ম্ম, হিতে অহিত, ও অহিতে

হিত, এইরূপ বিপরীত দর্শন হইতে থাকে, এবং লোক সকল উচ্ছৃঙ্খল হইয়া মহান্ অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানের পর যেদিন লোকনাথ হরি পৃথিবী ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, সেই দিনই কালক্রমে কলিযুগ সবলে পৃথিবীকে আক্রমণ করিয়াছে। কলির ভীষণ আক্রমণে ত্রিকালদর্শী ব্রাহ্মণ সন্তানের দৃষ্টি শিথিল হইয়া দিঙ্মোহ জন্মিয়াছে। কত ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিল। কত বৌদ্ধ হইল। কত মুসলমান হইল। কত খৃষ্টান সাজিল। কেহ বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া 'নিরাকার এস হে' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ইহাই কলির প্রারম্ভ হইতে ভারতের ইতিহাস,—সস্তায় ধর্ম্মপ্রচার ও প্রলোভন-বন্যায় যে সকল ব্রাহ্মণ ডুবিয়াছিলেন, ঐ স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে না পারিয়া, যে সকল ব্রাহ্মণ সন্তানগণ পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের স্বধর্ম্মত্যাগ করার কি অধিকার ছিল?

বেদ—যাহা নিত্য প্রমাণ, দেবতাও যাহা অভ্রান্ত বলিয়া সাদরে গ্রহণ করেন, তাহার অবহেলা করিয়া অপরিণামদর্শী উষ্ণ মস্তিষ্ক অজিতেন্দ্রিয় যুবক যদি নিজ খেয়ালকে প্রমাণ বলে, তাহা হইলে তাহার অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ বলিতে হইবে। "স্বধর্ম্মত্যাগ" এদেশে একটা অভিশাপের মধ্যে। সন্তান ভবিষ্যতে পাছে ধর্ম্মত্যাগ করে, এই ভয়ে পিতামাতার হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে, এবং পিতৃলোক ব্যথিত হয়েন।

স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যে পরধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহার কি সমীচিন যুক্তি থাকিতে পারে? যদি শুধু স্বকীয় বুদ্ধিকে প্রমাণ বলি, তাহা হইলে সে বুদ্ধি ভ্রান্ত। বেদ-বিরুদ্ধ বুদ্ধি বুদ্ধিই নয়—খেয়াল মাত্র। পরধর্ম্মযাজকগণের যুক্তি সর্ব্বদাই বেদ-বিরুদ্ধ। তাহা কখনও বিশুদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, বিধর্ম্মী আমার ধর্ম্মের কি জানে, বা

কি বুঝিবে? মন্দিরের বাহিরে থাকিয়া মন্দিরাধিষ্ঠাত্রীর খবর সে কি করিয়া বলিবে? এ মন্দিরে যে উহাদের প্রবেশ অধিকার নাই। অতএব উহাদের যুক্তি প্রমাণ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

সনাতন ধর্ম্মের রীত্যানুসারে ধর্ম্মত্যাগ কখনও হইতে পারে না। যে যে ধর্ম্মে আছে, সে সেই ধর্ম্মেই থাকিবে; তাহাকে শারীরিক বল কিংবা যুক্তি তর্কের দ্বারা পরধর্ম্ম গ্রহণ করাইলে সে, সে ধর্ম্ম, প্রকৃত পক্ষে গ্রহণ করে না; তাহার স্বভাব তাহা গ্রহণ করিতে চায় না, তাহার তাহাতে অধিকার নাই। সনাতন ধর্ম্মে এই প্রকার পরধর্ম্ম গ্রহণ রীতি নাই। অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে Convesion বলে, সনাতন ধর্ম্মে তাহা কুত্রাপিও দেখিতে পাইবে না। আজ আমি আর্য্য ধর্ম্মে, কাল আমি হঠাৎ খৃষ্টান হইলাম, তাহা হইতে পারে না। ধর্ম্মটা মানুষের এপিঠ আর ওপিঠ নয়, যে উল্টাইয়া দিলেই হইল। It is a process of development, a course of evolution through ages. ধর্ম্ম বহু জন্মের সাধনার বস্তু। অতি ধীরে ধীরে মানব জাতিতে ইহার বিকাশ হয়। বহুজন্ম পরে ইহা পাইবার যোগ্যতা লাভ হয়।

আজ হিন্দু, কাল মুসলমান, পরশ্ব খৃষ্টান—এইরূপ ভাব বাজীকরের ভেল্কীতে সম্ভব। যাহা নিত্য সত্য ও সনাতন ধর্ম্ম, তাহাতে এইরূপ চিত্ত চাঞ্চল্যের স্থান নাই।

তার পর যে কোন ধর্ম্মই গ্রহণ কর না কেন, তাহা কখনও নির্দ্দোষ নহে, উহার যাজকগণ যদিও উচ্চকণ্ঠে নির্দ্দোষ বলিয়া কীর্ত্তন করে বটে।

গীতা প্রমাণ—

"সর্ব্বরম্ভাহি দোষেণ ধুমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।

সমুদয় ধর্ম্মকর্ম্মই ধুমাবৃত অগ্নির ন্যায় দোষে আবৃত। কারণ,

যে ধর্ম্মেই প্রবেশ করিবে, সেই ধর্ম্মেই এইরূপ দূষণীয় কর্ম্ম আছে সেই ধর্ম্মই বন্ধনের কারণ। সেইজন্য চিরাচরিত সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিস্তার পাইবার কোন উপায়ান্তর নাই। যে ধর্ম্ম-কর্ম্মে স্বভাব পুরুষানুক্রমে বদ্ধমূল হইয়াছে, সেই কর্ম্মেই জীবের বন্ধন শিথিল হইবার সম্ভাবনাও রহিয়াছে।

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণো পরধর্ম্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ" বিগুণ স্বধর্ম্ম সম্যকরূপে সম্পাদিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; বেদের অনুশাসন মতে আর্য্য সমাজ গঠিত। বেদই শরীর ধারণ পূর্ব্বক আর্য্যজাতি রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

আর্য্যগণ কোন দেশ জয় করিয়া সেই দেশ বাসীর ধর্ম্ম জয় করিবার কখনও প্রয়াস পান নাই। সে দেশের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, কর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দিয়াছেন। আর্য্যগণ জানিতেন যে, কোন জাতি বা ব্যক্তিকে স্বধর্ম্মচ্যুত করাইলে তাহাকে তাঁহারা আর সে ধর্ম্ম ফিরাইয়া দিতে পারিবেন না। কিম্বা তাহাকে নিজধর্ম্মে গ্রহণ করিলেও, জাতীয় পংক্তিতে স্থান দিতে পারিবেন না। আজ যদি সমস্ত ম্লেচ্ছজগৎ সদাচার পরায়ণ হইয়া সনাতন ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে কি তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া কখনও অভিহিত হইবে? কখনও না? জ্ঞানে তাহারা ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, তথাপি বংশ হিসাবে তাহাদের ব্রাহ্মণ হইবার কোন অধিকার নাই। কারণ, কেহ কাহারও উৎপত্তি স্থান বদলাইতে পারে না। যবন বা ম্লেচ্ছগণ ঋষিতুল্য হইতে পারেন। ব্রাহ্মণ তাহাকে সম্মান ও ভক্তি করিতে পারে। কিন্তু আর্য্যসমাজে তাহাদিগকে আর্য্য বলিয়া কখনই স্বীকার করিবে না। সনাতন ধর্ম্মানুসারে যে, জাতি, সে সেই জাতিই থাকে; এবং তাহা হইতেই মুক্তি লাভের অধিকারী হইতে পারে।

এই ভারতক্ষেত্রে অনার্য্য জাতিতেও সদাচার পরায়ণ অনেক

মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। সেই ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতির দরুণ, সেই সেই জাতির বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। ব্যক্তিগত উন্নতি বা অবনতিতে জাতি বিশেষ লাভ বা ক্ষতি গ্রস্ত হয় না।

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু—
জাতিরূপেণ সংস্থিতা।"

জাতি ত্রিকাল স্থায়ী; ভূত ভবিষ্যত এবং বর্ত্তমানে তিনেই জীবন্ত এবং বিদ্যমান। ভূতে জাতির মূল, বর্ত্তমানে ইহার কাণ্ড শাখাপ্রশাখা ইত্যাদি, ভবিষ্যতে ইহার পুষ্প বা ফল। বর্ত্তমানে ব্যক্তিগত কার্য্যের জন্য অনাদ্যনন্তকালব্যাপী মূল এবং ফুলফল বিনষ্ট হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বটে। কর্ম্মচাণ্ডাল নামে অভিহিত হইতে পারে। কিন্তু জাতিতে সে সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ। ব্যক্তিগত দোষ বা গুণের আধিক্য বা ন্যূনতা জাতিকে উন্নত বা অবনত কি করিয়া করিবে? অনেক ব্রাহ্মণের পতনে, ব্রাহ্মণ জাতির পতন হইতে পারে না। যদিও এই কলিকালে জাতিগত দোষ অনেক পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে ত্রিকালদর্শী ব্রাহ্মণ জাতির কি করিয়া পতন হইতে পারে? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারিযুগব্যাপী ব্রাহ্মণের বিস্তার কল্পনা করিলে, কলির ক্ষীণপাপ ব্রাহ্মণজাতিকে কখনই একেবারে সমূলে উৎখাত করিয়া ফেলিতে পারে না। এত বড় একটা জাতির বিপুল সাধনাকে কলির দুষ্টশক্তি কিছুতেই নষ্ট করিতে পারিবে না। যেমন একটী ধান্যবীজ সুরক্ষিত হইলে, সেই জাতির বহুধান্য তাহাতে রক্ষিত হয়, একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গে বিশ্বদগ্ধ করিবায় শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে, সেইরূপ একটী তেজস্বী ব্রাহ্মণে একটী মহতী ব্রাহ্মণ জাতির সম্ভাবনা রহিয়াছে, এবং ক্ষত্রিয়ভারহারী সহস্র সহস্র পরশুরাম লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করিতেছে।

( ৫ )

## বনেদীঘরের ছেলে

পরকে ভালবাসিতে হইলে, আপনাকে ভুলিতে হয়। ভারত-নাট্যশালে, আর্য্য-অনার্য্য সম্মিলনে, আর্য্যজাতিকেও সেইরূপ আত্ম-বিস্মৃত হইতে হইয়াছে। কর্ম্ম-চাণ্ডালযোগে আর্য্যের আর্য্যত্ব লোপ পাইয়াছে। পর-পদ-সেবা যাহাদের ধর্ম্ম, তাহারা আবার কিসের আর্য্য? পাঠক! দুঃখিত হইও না। এ বড়াই কদিন চলে? 'বনেদি ঘরের ছেলে'—যতদিন বাপদাদার নাম ও বংশের মুখোজ্জ্বল রাখা যায়, ততদিনই ঐরূপ অভিমান সাজে। নচেৎ আঁধার ঘরে বড় ছোট, শুক্ল কৃষ্ণ, সবই সমান।

কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ইংরাজ ঈশ্বরেচ্ছায় এ দেশের একছত্র অধিপতি হইয়াছে। অপ্রতিহত গতিতে সে তাহার কার্য্য করিতে থাকিবে। অযুত কণ্ঠের আর্ত্তনাদ, লক্ষ স্বাক্ষরের আবেদন পত্র, সংবাদপত্রের কোলাহল, গোলদীঘির গলা বাজি কিছুতেই ইংরাজকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারিবে না। ইংরাজ এখন ভগবল্লব্ধ-বরদৃপ্ত—ব্রহ্মার বরে বলীয়ান; সত্যকথা বলিতে গেলে, ইংরাজ ভারতের অনেক মঙ্গল সাধন করিয়াছে, আরও করিবে। এই কর্ম্মচাণ্ডালগণের মস্তকে অহরহঃ পদাঘাত করিয়া, উহাদের আত্মসম্মান জাগাইয়া তুলিবে। পদাঘাত চলিতে থাকুক, নচেৎ এই অর্দ্ধবর্ব্বরের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইবে না। এই সংসারে মঙ্গল করিতে গেলেও কতক পরিমাণে অমঙ্গল করিতে হয়, অমঙ্গলের সাথে মঙ্গল আসিয়া পড়ে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নিশান তুলিয়াছে, উহার ছায়ায় বহু অজ্ঞমূর্খ চর্ব্বিত চর্ব্বণ আরম্ভ করিয়াছে। উহার সংস্পর্শে সমগ্র মানবজাতি দূষিত হইয়া যে পৃথিবী বিধ্বংসী মহা-প্রলয়ের সংঘটন করিবে, তাহা উহারা বুঝিতে পারে না।

সবাই মানুষ। সকলেরই দু'হাত দু'পা। তবে একজন ব্রাহ্মণ, একজন চণ্ডাল, এ কেমন জাতি বিভাগ? কি ঘোর স্বার্থপরতা। আবার বলে "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং"। ঈশ্বরই এ জাতিভাগ করিয়া দিয়াছেন। কি পক্ষপাতী ঈশ্বর, কি ভীষণ পক্ষপাতী! দেও, জাতিভেদ তুলিয়া দেও। সকলেই খ্রীষ্টান হও, না হয় ব্রাহ্ম হও, অথবা যা, তা, আর একটা নূতন কিছু হও। এক ঈশ্বরের পুত্র হও। বিশ্বকে প্রেম কর। "রামনারায়ণ চাটার্জ্জী, আর শ্যামনারায়ণ মুখার্জ্জী পৈতা ফেলিয়া "তোবা" "তোবা" করিয়া বিশ্বপ্রেমিক সাজিলেন।

"এওকি বটে, চা'র পেয়ালা চুমুক দিলেই জয়।"

ব্রাহ্মণই প্রথম সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণেরই পতন প্রথম হইল। মাথা খসিল, শরীর ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইল। ফলাহারভোজী ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ "দিল্লীকা লাড্ডুর" লোভে পড়িয়া অবশেষে পস্তাইলেন। জগতের এবং ধর্ম্মের অবনতির জন্য ব্রাহ্মণই দায়ী, বর্ত্তমান অধঃপতনের কৈফিয়ৎ ব্রাহ্মণকেই দিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ! তুমি কখনও ভবিষ্যপুরাণের পাতা আওড়াইয়া লোক গঞ্জনা হইতে, 'যেন তেন' উপায়ে অব্যাহতি পাও। কখনও বা "কলিকাল—কি করি" এইরূপ খেয়ালে আত্মপ্রবঞ্চনা কর। তপঃ, যজ্ঞ, হোম, সবই ছাড়িলে; সে তপস্যা, সে সঙ্কল্প দার্ঢ্য—কিছুই তোমার নাই। খাকী পোষাকের নীচে পৈতা ঢাকিয়া সটান্ হইয়া সেলাম ঠোক, আর "কি করি—কি খাই—কলিকাল" এই বলিয়া আপনাকে

প্রবোধ দেও। রে অধঃপতিত আর্য্যজাতির পুরোহিত! কর্ম্মচাণ্ডাল সাজিয়া আপনাকে কত কি মনে করিতেছ,—তুমি "খাই কি" বলিয়া যে শ্ববৃত্তি অবলম্বন কর, উহা শৃগাল কুক্কুরেরও ঘৃণিত। উদর পরিতৃপ্তির নিমিত্ত তোমার ব্রাহ্মণ-দেহ পাত কর, উহা ত শূকর দেহেও সম্ভব হইতে পারে। যদি শৃগাল কুক্কুর বা শূকর হইয়া জন্মিতে, তাহা হইলে কি তোমার আহারের জন্য ভাবিতে হইত। তুমি ঘৃতমধু ইত্যাদি সুস্বাদু ভোজনে যে পরিমাণে হর্ষিত হও, শূকর বিষ্ঠা ভক্ষণে ঠিক সে পরিমাণ বা ততোধিক আনন্দ পায়। বিষ্ঠা সন্দর্শনে শূকরের যে প্রীতি, তাহা তোমাতে ইন্দ্রিয় শিথিলতা নিবন্ধন কখনও সম্ভবেনা। বিষয়ের অনুসন্ধানে শূকর ও ধাবিত হয়, তুমিও ততোধিক বেগে ছুটিতে থাক। তবে তুমি শূকর দেহ ধারণ না করিয়া, মনুষ্য বিগ্রহে অধিষ্ঠান করিতেছ কেন? সমস্ত জীব জগত যদি বিষয় ভোগের জন্যই উৎপন্ন হয়, তবে একরূপ দেহের উৎপত্তি হয় না কেন? এ বিভিন্নতা কেন? তোমার মনুষ্য দেহের, তোমার ব্রাহ্মণ দেহের বিশেষত্ব কি?

হে শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ—তোমাকে জটীল প্রশ্ন করিয়া ফেলিয়াছি। বলিতে পার কি, কোন তারিখ হইতে বেদ পাঠ ছাড়িলে? কোন দিনে বেদ-বেদান্ত সম্পূর্ণ ভুলিলে? এবং কোন মাহেন্দ্রক্ষণে, হে মহামহোপাধ্যায়! পরপদ লেহন পটুতা শিক্ষা করিলে? বহু শাস্ত্র ন্যায় স্মৃতি পাঠ করিয়া ন্যায়-পঞ্চানন সাজিয়াছ। তুমি মুক্তকচ্ছ উর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া যখন বিতণ্ডায় ব্রতী হও, তখন রঙ্গস্থল কাঁপিতে থাকে। তুমি নানাবিধ বাকচাতুর্য্য বিস্তার করিয়া প্রতিদ্বন্দীকে পরাজয় কর; অধিক পারিতোষিকে অধিকতর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে থাক এবং আশীষ বর্ষণ করিয়া সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ কর।

তুমি যৎকিঞ্চিৎ লভ্য পাইলেই যে কোন রূপ ব্যবস্থা দিতে পার।

শাস্ত্রের ব্যাখ্যা তোমার নখদর্পণে। রে বিপ্র-দেহধারী অসুর! তোমাকে আমি কি শাস্ত্র শিখাইব? তুমিত সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী! তুমি যদি শাস্ত্র না শিখিবে, না জানিবে, তবে ভারত ধর্ম্মমণ্ডল দূষিত করিবে কে? কে এই জগতকে ক্ষয়ের মুখে নিক্ষেপ করিবে?

রে অজিতেন্দ্রিয় শিশ্নোদর পরায়ণ ব্রাহ্মণ! তুমি গৃহী সাজ বটে, তোমার গৃহে কোন পাপকর্ম্মটার অনুষ্ঠান না হয়? তুমি আজ কাল আবার নূতন ধরণে শিক্ষিত হইয়া, সহধর্ম্মিণী লইয়া, পাখীর মতন ডালে ডালে উড়িয়া বেড়াও। রে অজিতেন্দ্রিয় শিশ্নোদর পরায়ণ যুবক! হীন বীর্য্য বহু অপত্য সৃজন করিয়া, আর্য্যকুল আর্য্যজাতি দূষিত করিয়া ফেলিলে!

তোমাকে কর্ম্মচাণ্ডাল বলিয়া যে অভিহিত করিয়াছি, তাহা অন্যায় হয় নাই। সবই সহ্য করিতে পারি। শুধু তোমার এ দৈন্য-দুর্দ্দশা সহ্য করিতে পারি না!

যে ব্রাহ্মণের পদ প্রান্তে বিন্ধ্যাদ্রি মস্তক বিলুণ্ঠিত করিত, সেই ব্রাহ্মণ বংশধর আজ বিধর্ম্মীর পদপ্রান্তে মস্তক লুটাইবে, ইহা সহ্য করিতে পারি না। চন্দ্রসূর্য্য নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে, হিমাদ্রি কাল-সমুদ্র গর্ভে ডুবিবে, বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মতেজ বিলুপ্ত হইবে. ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। হিমাদ্রি-পাষাণ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, যাক; চন্দ্র সূর্য্য ভূতলে বিলুণ্ঠিত হয়, হউক: তথাপি ব্রাহ্মণের এ অধঃপতন কখন সহ্য হয়না। যাহার পদলাঞ্ছন শেষশায়ী সাদরে বক্ষে ধারন করেন, সেই ব্রাহ্মণের বংশধর আজ মস্তক অবনত করিবে, ইহা কি করিয়া সহ্য করি. বল!

মস্তক অবনত করিলে সমস্ত শরীর অবনত হয়। ব্রাহ্মণ অবনত হইলে, সমস্ত সমাজ অবনত হয়, আর্য্যজাতি অবনত হয়। আজ ব্রাহ্মণ অবনত হইয়াছে, সমগ্র ভারত অবনত হইয়াছে:

ব্রাহ্মণ! কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইও না। বহু সাধ্য-সাধনার পর উৎকৃষ্ট মানব দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ; ঐ দেহ দ্বারা জগতের প্রভূত হিত সাধন করিতে পারিবে। ব্রাহ্মণই লোকে হিতের নিমিত্ত স্বকীয় অস্থি প্রদান করিতে সক্ষম।

যদ্যনিত্যেন দেহেণ সাধ্যতে জগতাং হিতং।
কাচ মূল্যেণ লভ্যেত তদা চিন্তামনির্ময়া॥
অপূণ্যাণি দেহাস্থিনি ধন্যাহং যস্যতানিমে।
গমিষ্যস্থ্যপযোগাত্বং পুণ্য লোকহিতব্রতে॥

এই অনিত্য দেহের দ্বারা যদি জগতের হিতসাধিত হয়, তাহা হইলে কাচমূল্যে আমি কাঞ্চণ লাভ করিলাম। দেহান্তরে যে দেহাস্থি অস্পৃশ্য ও ঘৃণিত হইবে,—অহো আমি ধন্য! সেই অপুণ্য অস্থি আজ পুণ্য লোক-হিত-ব্রতের উপযোগীত্ব প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া মনুষ্য-শ্রেষ্ঠ মহর্ষি দধীচি যোগাবলম্বন পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলেন। এবং তাঁহার অস্থিতে বজ্র প্রস্তুত হইয়া স্বর্গরাজ্য নিষ্কণ্টক হইল।

ব্রাহ্মণ সন্তান! তোমার দেহের বিশেষত্ব এখন ও চিন্তা করিয়া দেখ। জীবনের উদ্দেশ্য কি, তাহা স্থির করিয়া অবিলম্বে কার্য্যে ব্রতী হও, এই মহার্ঘ জীবন লইয়া খেলা করিও না। তুচ্ছ তাচ্ছিল্যে ইহাকে বিনষ্ট করিওনা। ইহার মহান্ উদ্দেশ্য আছে। তুমি সেই উদ্দেশ্য সাধন কর।

Young brothers, when once you have conceived and determined your mission within your soul. let naught arrest your steps. fulfil it with all your strength, whether blessed by love or visited by hate.

You are cowards, unfaithful to your own future, if, inspite of your sorrows and delusions, you do not pursue it to the end"

সতীর্থগণ ! অনেক কটূক্তি করিলাম বলিয়া দুঃখিত হইতেছ। মহা কেশরীকে পিঞ্জরাবদ্ধ দেখিয়া কাহার না দুঃখ হয় ? কে না ক্ষুব্ধ হয় ? দুঃখ রোষ প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারি নাই বলিয়া, অনেক অপ্রিয় বলিয়াছি। অরণ্য বিহারী মহাগজ যদি শৃঙ্খলিত হয়, তবেমূষিক ও তাহার দুঃখে দুঃখিত হয়। বলিতে পার, কর্ম্মযোগিন্ লিখিতে বসিয়া দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাইলে ও ক্রূদ্ধ হইলে, নিষ্কামের ভাব ছুটিয়া যাইবে। তুমি গৃহহীন তোমার আবার দুঃখ কি ?

লোকে দুঃখে পড়িয়া ভগবানকে ডাকে। কর্ম্মযোগিন্ উহাদের সাথে অপার দুঃখে পতিত হইয়াছে। কর্ম্মযোগিন্ দুঃখহীন হইলেও, ইহার প্রতি পৃষ্ঠা অনন্ত দুঃখের খনি। ইহার প্রতি পংক্তি কাল মৃত্যুর বিদ্যুৎ জিহ্বা, বিদগ্ধ হৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তনাদ, প্রলয়-বহ্নি-প্রস্রাবী আগ্নেয় গিরির মুখবিবর। কর্ম্মযোগিন্ ঘোর বেদান্তী হইলেও, বর্ত্তমান কর্ম্মচাণ্ডাল যোগে উৎকট দুঃখ, মিথ্যা মোহ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেছে না। বেদান্ত-ভূমি হইতে মহাযোগী নামিয়া আসিয়াছে। সে আজ একচক্রায় অতিথি, গৃহস্বামীর করুণ আর্ত্তনাদে তাহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে।

সার্ব্বজনীন দুঃখের জন্য হৃদয়ে যে বেদনার অনুভূতি, এবং আর্ত্ত-ত্রাণের নিমিত্ত যে চেষ্টা, তাহা কখনই বন্ধনের হেতু নয়। আর্ত্তত্রাণের নিমিত্ত যে ভগবৎ-স্মৃতি তাহা মোক্ষ বিধায়িনী।

কর্ম্মদানবের উগ্রতাণ্ডবে এবং ভীষণ কোলাহলে, মুক্তির বাণী ডুবিয়া যাইতেছে, সত্য। এই বধির-জনতা বিজয়-দুন্দুভির বজ্র নির্ঘোষ শুনিয়াও শুনিতেছে না, সত্য।

সর্ব্বতোক্ষি-পাদমুখ শেষশায়ী সহস্রশীর্ষ পুরুষ কবে জাগিয়া উঠিবেন, সনাতন ধর্ম্ম মন্দির মুকুট কবে আবার অভ্রভেদ করিয়া, ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক, সুনীল অম্বরে আর্য্যজাতির বল-বীর্য্য-যশ-

গৌরবের ধবল হাস্য রাশিরূপে হাসিতে থাকিবে, মুক্তির নিশান পত পত করিয়া কবে উড়িবে; এই চিন্তায় কর্ম্মযোগিনের অন্তরাত্মা ধ্যানস্থ। কালগর্ভে ভারতের ভবিষ্যপট সন্দর্শন করিয়া নিবাত-নিষ্কম্প নিশ্চল দীপ-শিখায় ন্যায় কর্ম্মযোগিনের অন্তরাত্মা আজ ধ্যান-মগ্ন। তবে যে মহামায়ার উৎকট প্রেরণায় এক অস্বাভাবিক অশ্রুতপূর্ব্ব গভীর গর্জ্জন শুনিতে পাইতেছ, তাহাতে ধৈর্য্য-চ্যুত হইওনা ; মহামেঘ বিদারী অশনিশিখা যে মরণের উৎকট হাসি হাসিয়া, ক্ষণেকে অন্তর্হিত হইতেছে, উহাকে খদ্যোতিকা মনে করিওনা।

## ব্রাহ্মণের অধঃপতন।

ব্রাহ্মণেতর জাতি উন্মার্গগামী হইলে, ব্রাহ্মণ তাহাদিকে সৎপথে ফিরাইয়া আনিবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছৃঙ্খল হইলে, তাহাকে ফিরাইবে কে? জাতি চতুষ্টয়ের শাস্তা, বর্ণাশ্রমের সে রক্ষক কোথায়?

এযে নূতন কর্ম্মযুগ। এযে Equality fraternityর দিন। ইহাকে যে সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতা বলে। পাশ্চাত্যের নূতন চিন্তা, নূতন ভাব, ভারতের নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। কালধর্ম্ম মানিয়া চলিতে হইবে।

পাশ্চাত্য ধরণে শিক্ষিততোতাপাখীর মুখে এবম্প্রকার যুক্তিবাদ শ্রবণে মনে কখনও ক্ষোভের উদ্রেক হয় না।

কিন্তু প্রাচ্য "ঘট-পটিয়ার" মুখ হইতে ঈদৃশী যুক্তি বিনির্গত হইলে মনে হয়, বেদ-বেদান্ত দর্শন-শাস্ত্র প্রভৃতির সমাধিস্থল, ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মবিদ্যায় মহাশ্মশান, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সেই টোল। উহাতেও কলি পূর্ণাধিকার বিস্তার করিয়াছে—"ঘটপটীয়ার" এই যুক্তিকে শিথিল করিতে হইবে।

আজ ব্রাহ্মণের অধঃপতনে ভারত যে মুখ অবনত করিয়াছে, জাতি ধর্ম্ম যে কালচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া যাইতেছে, ঐ ভাবেই কি উহা চলিতে থাকিবে? কালচক্রের ঐ গতি কি আর অবরুদ্ধ হইতে পারে না? কেহ কি উহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না?

দেশ কাল পাত্র ভেদে বাবস্থা করিতে হয়? দেশকাল পাত্র ভেদে ভারতের ভাগ্যে যে ব্যবস্থা হইয়াছে, উহার কি পরিবর্ত্তন নাই? দেশকাল পাত্র যখন পরিবর্ত্তনশীল, তখন ঐরূপ ব্যবস্থাকেও চিরস্থায়ী বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

জগচ্চক্র নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কলা, কাষ্ঠা মাস, ঋতু অনবরত ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, যাইতেছে। জীবশরীর শৈশব, যৌবন কৌমার, বার্দ্ধক্য, জরা, মৃত্যুর ভিতর দিয়া নিরন্তর গতিবিধি করিতেছে, এইরূপে মানব দেহ এবং মন অহরহঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

এই অনন্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে ভারতের ভাগ্য-চক্র কি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না? যে কাল ভারতের অদৃষ্ট-চক্র উল্টাইয়া দিয়াছে, সেই কালচক্র কি উল্টান যায় না?—যায়।

রাম কার্য্যে আমি ঐ কালচক্রের গতি রুদ্ধ হইতে দেখিয়াছি। প্রভাত-মধ্যাহ্ন এবং সায়াহ্নে আমি বিপ্লবের সেই ঘনঘটা সন্দর্শন করিতেছি।

দিবসকে ধ্বংস করিয়া প্রলয়ের নৈশ অন্ধকার গগন মণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে! আবার সেই অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া করুণ অরুণ পূর্ব্ব দিকে রক্তিম হাসি হাসিয়া উঠে। এই সংহার ও সৃজন, সঙ্কোচ ও বিকাশ—প্রকৃতির দৈনিক ক্রিয়া। একটা মহাশক্তির প্রয়োজন। প্রতি মুহূর্ত্তে এই বিপ্লব, এই সংহার এবং সংগ্রাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই মুহূর্ত্তগুলি একত্রে হইলে একটা মহাবিপ্লবের সৃষ্টি হয়। মানুষের বুদ্ধি যখন আহ্নিক ক্রিয়ার অভ্যন্তরে, এই সংগ্রাম গুলি সন্দর্শন করিতে থাকে, তখন মনুষ্য-বুদ্ধির মলীমসা ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হইয়া আসে। কালে এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার তাহার স্বচ্ছ-বুদ্ধিদর্পণে একটী মহান বিপ্লবের নিরন্তর সৃজন ও সংহারের প্রতিবিম্বরূপে প্রতিফলিত হয়। প্রভাত-সূর্য্য যখন মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবী দগ্ধ করিতে থাকে, বিদগ্ধ হৃদয় উহার অভ্যন্তরে একটা মহান্ বিপ্লবের আভাস পায়। সেই প্রখর সূর্য্য যখন দিগ্‌বিদিক আক্রমণ করিতে থাকে, সে ও কি একটা বিপ্লব, একটা ভীষণ

পরিবর্ত্তন নয়? জাগ্রত মানুষ যখন ঘুমাইয়া পড়ে, কিম্বা ঘুমন্ত মানুষকে যখন জাগাইয়া তুলিতে হয়, তখন কি একটা বিপ্লবের অনুভূতি হয় না? চোখের উপর দিয়া, লোকের পিঠের উপর দিয়াই ত ঐ বিপ্লবগুলি চলিয়া যায়। কে না উহা মাথা পাতিয়া নেয়।

সূর্য্য-কর-রশ্মি-বিধৌত-দৃশ্যমান এই জগত-প্রপঞ্চ যখন বিনষ্ট হইয়া একটা স্থূল অন্ধকারপিণ্ডে পরিণত হয়, তখন মানুষ রজনী ভর ঐ ধ্রুবনক্ষত্র দেখিয়া চলিতে থাকে। হতাশ হয় না, বা পথ হারায় না। গাঢ় নৈশান্ধকারাবরণ ভেদ করিয়া দিব্যজ্যোতি যে পৃথিবীতে অবতরণ করে, সেই ঘুমের ঘরে যাহারা জাগিয়া থাকে তাহারাই শুধু উহা দেখিতে পায়।

এ ত গেল কবিতার ভাষা। ইতিহাস পুরাণেও ঐ একই ধ্বনি।

এত আশা ভরসার মধ্যে আজ ব্রাহ্মণ হাল ছাড়িয়া দিল কেন? জাতির কর্ণধার, বর্ণাশ্রমেরগুরু ব্রাহ্মণ আজ অভিভূত হইল কেন?

ইহার কারণ পরম্পরা অনুসন্ধান করিতে গেলে, বাচ্য, অবাচ্য অনেক কথা আসিয়া পড়ে। তবে সংক্ষেপতঃ এই, যখন মানুষের চিত্ত নীচ স্বার্থের দাস হয়, তখন মানুষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; অতি অল্প লাভেই সে অত্যধিক হর্ষিত, অত্যল্পনাশেই সে অত্যন্ত অবসন্ন হয়। স্বার্থের এই নীচতা মানুষকে জাতি এবং সমাজ হইতে পৃথক করিয়া ফেলে। জাতি ধর্ম্ম এবং সমাজের প্রত্যবায়ে সে সেই ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই রূপ ক্ষুদ্র-দৃষ্টি মানব. সমাজ, জাতি এবং ধর্ম্মের প্রভূত অমঙ্গল সাধন করিয়া থাকে।

জাতি, ধর্ম্ম, দেশ বিনষ্ট হইয়া গেল, তাহাতে কাহার কি আসে যায়? ব্রাহ্মণ অধঃপতিত হইল,তাহাতে কাহার লোকসান? অধঃপতিত

ব্রাহ্মণ নিজেই মনে করে না, যে সে অধঃপতিত হইয়াছে। অন্যে পরেষু কা কথা।

জাতি ধর্ম্ম সমস্ত লইয়া আমরা যে ধ্বংসের মুখে ধাবিত হইয়াছি, তাহার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিবার লোক নাই যে তাহা নয়। খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় আমি যেমন অশ্রুমোচন করি, সেই রূপ কেহ কেহ এ কয়েক পংক্তি পাঠ করিয়া তাহার অনুমোদন ও করেন, সত্য। কেহ দূরে দাঁড়াইয়া ফিলিষ্টাইনদিগের ন্যায় অন্ধ-সামসনের ক্রীড়া সন্দর্শন করেন। কেহ বা চোখ ঢাকিয়া চলিয়া যান।

বর্ত্তমানে যে সমস্ত জাতি জগতে অর্থ এবং অস্ত্রবলে বলীয়ান তাহারা গোব্রাহ্মণ বেদ-বিরোধী। যাহারা ভারত-সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান শাসক তাহারা ত ভারতীয় প্রজাবৃন্দের সন্মুখে Equality fraternity or liberty, র নিশান তুলিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ এ রাজ্যে, এ যুগে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সব সমান। ব্রাহ্মণ্য গেলত, বয়ে গেল। তাহলে বিপথগামী ব্রাহ্মণকে ধরিয়া তোলে কে?

যে গ্রামে ব্রত ও অধ্যয়ন-শূন্য-ব্রাহ্মণ ভিক্ষা লাভ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পায়, রাজা সেই চৌরপালক গ্রামবাসীদিগকে বধদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।

ব্রত এবং বেদাধ্যয়নাদি-শূন্য ব্রাহ্মণগুলি বিপ্রদেহধারী অসুর। উহারা সৃষ্টির ধ্বংস করিয়া থাকে।

সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। ব্রাহ্মণের সে শাসনও নাই। আছে—কতকগুলি বেদান্ত-পিশাচ। সে ভাব গিয়াছে, ধুঁখে বালুচরের ন্যায় শুধু ভাষা পড়িয়া আছে। সে শক্তি নাই; আছে শুধু যুক্তি—"যুগধর্ম, কালধর্ম্ম, কলিকাল, সময় ইত্যাদি"—

অর্থাৎ—"আমার সংসারের বহুকাজ; আমি কিছু করিতে পারিব না। তোমরা দশজনে যা পার কর। আমাকে ভাই ছেড়ে দেও।" কি দুষ্ট যুক্তি, কি স্বার্থ বিজড়িত বুদ্ধি। ক্ষুদ্র-হৃদয়, ক্ষুদ্র স্বার্থের বশীভূত হইয়া সন্মুখে উত্তাল তরঙ্গ সন্দর্শনে হাল ছাড়িয়া দেয়।

বেদান্ত-পিশাচ সাজিয়া কর্ম্মত্যাগ করিলে চলিবে না। কর্ম্ম করিতে হইবে। অহঙ্কার আরও বড় করিতে হইবে। অহঙ্কার—Ambition, Aspiration—চাই। নীচ নহে, উচ্চজাতীয়। যুবক হৃদয়ের অভিলাষ, চন্দ্র ভেদ করিয়াও ধাবিত হইবে, সমুদ্র মন্থন করিবে। মৃত্যুকে উপহাস করিয়া হাসিতে থাকিবে—এত বড় অহঙ্কার। মূষিকাঞ্জলি নয়, যে সহজেই পূর্ণ হইবে। যুবকের ইচ্ছাশক্তি জগতকে আলোড়িত করিবে। এত বড় হওয়া চাই। যত বড় একদিন আমাদের আর কেহই হইতে পার নাই।

বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, বীর্য্যে পরশুরাম, সন্ধানে সব্যসাচী। মহাবিভূতিমান। ঐ বিভূতি, সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। অধঃপতিত জাতি এবং ধর্ম্ম এতটাই চাহে।

মূষিকাঞ্জলি অত্যল্পেই পরিপূর্ণ হয়। আজ আমার জাতি অত্যল্পেই তুষ্ট থাকে, আর বড় হইতে চায় না; বৈরাগ্যে যে উহার ইচ্ছাশক্তি শিথিল হইয়াছে,—তাহা নয়। পায় না, তাই চায় না। অভিলাষ কমে নাই। বহু, কিন্তু অস্পষ্ট। কাহারও কোন উদ্দেশ্য নাই। বাঁচিয়া আছ, শুধু মরেনা বলে।

## ব্রাহ্মণের অধঃপতন।

আত্ম-বিস্মৃতিই যে মৃত্যু, ব্রাহ্মণের অধঃপতনই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই বর্ত্তমান অবনতি-পঙ্ক হইতে উদ্ধার পাইবার কোন উপায় আছে কিনা, তাহা মানব-বুদ্ধির বিষয় নহে। ভগবানই জানেন। ব্রাহ্মণ যে বড় ছিল তাহা আজ উপকথা। দরিদ্রচিত্ত হীনবীর্য্য ব্রাহ্মণ-সন্তানের চক্ষে আজ দেশ ধর্ম্ম জাতি ইত্যাদি বিষয় আকাশ কুসুমের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। স্বাধীনতা শব্দে তাহারা "অশ্বডিম্ব" ব্যতীত আর কিছুই ধারণা করিতে পারে না। কোন কোন প্রতিভা-শালী শিক্ষিত মস্তিষ্কে উহা বিলাতের আমদানী বলিয়া বোধ হয়। কেহ বা উহাকে বিকৃত মস্তিষ্কের বিকট খেয়াল বলিয়া উড়াইয়া দেয়। এতাদৃশ মোহান্ধ মনুষ্য সঙ্ঘের নিকট "কর্ম্মযোগিনের সনাতন-ধর্ম্ম-প্রচার অরণ্যে রোদন বলিয়াই মনে হয়। অরণ্যেও বন-দেবতা আছে। প্রতিধ্বনির আশা থাকে। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান সমাজ মহা-শ্মশানে পরিণত। উহাতে জনমানবের সাড়াশব্দ মাত্র নাই।

এহেন আত্মবিস্মৃত জাতির সমক্ষে আত্মবিস্মৃত যুবক সনাতন ধর্ম্ম-প্রচার করিয়া কি ফল আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা বুঝিতে পারি না। তবে তিনি যদি ফলাকাঙ্ক্ষী না হন, সে অতি উচ্চ অঙ্গের কথা। "বর্ত্তমান কর্ম্মযুগের" লেখক তাহার ধারণা করিতে পারে না।

যে সরষেতে ভূত ছাড়াব, সেই সরষেই যদি ভূত হইয়া বসে, তবে আমার মন্ত্র তন্ত্র থাকে কোথা? জাতীয় চিত্ত যদি দীন হইয়া পড়ে, তবে তাহারা এই উচ্চাঙ্গ সত্য কি করিয়া ধারণ করিবে?

বস্তুতঃ আমার জাতি দিন দিন এত ছোট হইয়াই পড়িল ! ভগবানের যে কি বজ্রকঠিন অভিশাপই আসিয়া ইহার মস্তকে আপতিত হইল, যে ইহাকে দেশ-ধর্ম্ম-জাতির বর্ণবোধ হইতে শিখাইতে হইতেছে ! প্রথম যখন নবীন উদ্যমে জাতির উদ্ধারের নিমিত্ত বজ্রদৃঢ় লৌহ লেখনী চালনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, যে উহারাত "কোল" "নিগ্রো "হটেন্‌টস্" নয়, যে ইহাদিগের শিক্ষা, বর্ণ-মালা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। গীতার দুচার শ্লোক নূতন ধরাণে ( Modernized করিয়া ) ব্যাখ্যা করিলেই, মৃত-সঞ্জীবনীরসে ইহারা লাফাইয়া উঠিবে। মন্ত্র যদিও ব্যর্থ হইল না বটে, অকালে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গের ন্যায় যেন পরিণামটা দাঁড়াইল। তাই মনে হয় আর অকালে ইহাদের ঘুম ভাঙ্গাইব না। মৃত-ভেক-দেহে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করিয়া যে কোন ফল হইবে না, তাহা বুঝিতে পারিয়াই এই লৌহ-লেখ-বজ্র সময় সময় বিরক্তি বশতঃ দূরে ফেলাইয়া দেই। কিন্তু, সম্পাদক ভায়া হে, তুমি যে আমাকে কি যাদু করিয়াছ, আমার কর্ণ কুহরে কত মধুই ঢালিতেছে, সেই যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া, সপ্তাহে সপ্তাহে তোমায় কাগজের কলম্ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত "ওয়াগণ" বোঝাই করিয়া আমাকে প্রবন্ধ পাঠাইতে হয়।

আর দেখ, আমি ও ত একটা কলির জীব ; ব্যাস বশিষ্ঠ নই যে ব্রাহ্মণ গুলাকে শিক্ষা দিব ! এ ধৃষ্টতা আমার বড় ভাল বোধ হয় না। তথাপি তুমি বন্ধুলোক, তোমার অনুরোধ এবং আমার কর্ম্মভোগ ; যা'হক লিখতে থাকি, যেখানে এখন দাঁড়ায়।

নিরাশা যদি হৃদয়কে গ্রাস করে, তাহা হইলে আর এ জগতে অগ্রসর হওয়া যায় না। আশা এবং নিরাশা জীবের হৃদয়ে ছায়া ও আলোকের ন্যায় খেলা করিয়া বেড়ায়। জগতস্থ সমস্ত জীব জন্তুই বোধ হয় এই চিত্তবৃত্তিদ্বয়ের বশীভূত। বন্য পশু পক্ষীর মনের

আশা কি? স্বচ্ছন্দে বনজাত-ফলমূল-তৃণ-শস্যপূর্ণ অসীম প্রান্তরে উদ্দাম বিচরণ এবং সময় সময় চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করা। এই মনুষ্য সমাজের আশা কি?—চর্ব্বিত-চর্ব্বণের রোমন্থন। মূষিক-হৃদয়ের আশা কি—তাহা আর বিশেষ বিস্তৃত করিয়া বলিতে হইবে না।

পলাশীর অভিনয়ের সময় যখন একদল ব্রাহ্মণ কেষ্টচন্দ্রের বাড়ী ভোজ খাইয়া ব্রহ্মত্র-গ্রহণে তৎপর ছিল; এবং একদল "বল্লালপন্থী" বহু বিবাহ করিয়া দেশের দারিদ্র্য ভার বাড়াইতে ছিল, তখন হইতেই আশা ভরসার মেঘ উড়িয়া ভারতের ভাগ্যাকাশ ফরসা গিয়াছে।

ব্রাহ্মণের পৌরহিত্য যদি ষষ্ঠী পূজায় চাল্‌-কলাতেই পরিণত হয়, তবে সে রাজ্যের কল্যাণ কোথায়? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ক্ষত্রিয় অন্তর্ধান করে। তাহার পর মাঝে মাঝে দুই একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বহির্গত হইয়া সুপ্ত-ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ দিয়াছে বটে। সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ গুলি ব্রাহ্মণের ফুৎকারেই বিনির্গত হইয়াছিল! কিন্তু উহার অত্যল্প সময় পরেই যেন ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব একবারেই নির্ব্বাণ হইয়া গেল। দেশ ও কালানুযায়ী ক্ষত্রিয়ত্ব বিকাশ হইবার আজকাল কোন সুযোগই নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব পরিবর্দ্ধিত করিবার যথেষ্ট সুযোগ এবং সুবিধা রহিয়াছে। ব্রহ্ম-বল ব্যতীত উদ্ধার পাইবার আর কোন উপায় আছে কিনা জানি না। অতএব ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিতে হইবে।

ভগবানেরও বোধ হয় সেই ইচ্ছা; আবার এই আত্ম-বিস্মৃত জাতিকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন, যে ব্রহ্মবলই বল। তপস্যাই একমাত্র আশ্রয়। আবার বোধ হয়, ব্রাহ্মণ ঈশ্বরানুগ্রহে তাহার নিজস্ব ফিরিয়া পাইবে।

কারণ, মানুষের যত প্রকার বল প্রত্যক্ষ হয়, জড়বাদী যে বলের উপর নির্ভর করিয়া জড়বৎ প্রতীয়মান এই মৃৎপিণ্ডকে পদানত করিয়া

রাখিতে চায়, অস্ত্র-বল, ধনবল, ইন্দ্রিয়-সুখকর যত প্রকার বলই হউক না কেন, তাহা ভগবান এ জাতির হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন। সেই সকল বল ইহারা আর সহজে আয়ত্ব করিতে পারিবে না।

জড়বাদী এই ব্রহ্মবলের গতি লক্ষ্য করিতে না পারিয়া, উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেয়। স্থূলচক্ষে দেখিতে পায় না বলিয়া ইহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে পারে না।

তপস্যার গতি অতি সূক্ষ্ম। একবংশে একটী তপস্বী ব্রহ্মচারী জন্মিলে সেই বংশে আর শ্রাদ্ধ তর্পণের প্রয়োজন হয় না। তপস্যা-প্রভাবে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ত্রিকালই পবিত্রীকৃত হয়।

"যেই পথ দিয়া গতি করেন সন্ন্যাসী।
আড়ে পাশে চারি ক্রোশ সমতুল্য কাশী॥"

তপস্বী যে বংশে জন্মেন, সে বংশ পবিত্র হয়। তপস্বী যে দেশে জন্মেন, সে দেশ পবিত্র হয়। তপঃশক্তি মহাসংক্রামক হইয়া জাতীয় জড়তাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, আত্মবিস্মৃতি বিনষ্ট করিয়া ঘুমন্ত জাতিকে জাগাইয়া তোলে। ব্রাহ্মণ সেই তপস্বী জাতি। ব্রাহ্মণ উদ্ধার হইবে। জাতি ধর্ম্ম সবই উদ্ধার হইবে।

রে আত্মবিস্মৃত ব্রাহ্মণ যুবক, স্বার্থ ভুলিয়া যাও। যদি মানুষের মত হইতে চাও, তবে এই তপঃশক্তিতে অচল অটল বিশ্বাস স্থাপন কর। সদগুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর। অন্তঃসলিলা নারায়নী শক্তি অচিরাৎ প্রকাশিত হইবে, সন্দেহ নাই।

# নাগা সভ্যতা

সংস্কৃত 'নগ্ন' শব্দের অপভ্রংশ 'নাগা', অর্থাৎ উলঙ্গ, অথবা Naked। এখানে সে অর্থে 'নাগা' শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই।

নগ্ন কাহারা? নগ্নের স্বরূপ কি? বর্ণত্রয়ের আবরণ স্বরূপ ঋক্ যজু এবং সাম্ এই বেদত্রয়কে যাহারা মোহবশতঃ পরিত্যাগ করে, তাহারাই নগ্ন। ত্রয়ী অর্থাৎ তিন বেদই সমস্তবর্ণের সংবরণ। অতএব এই ত্রয়ীরূপ সংবরণ পরিত্যাগ করিলে নগ্ন আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ইহাতে সংশয় নাই। ইহা পরাশর বাক্য।

বেদ-বহির্ভূত জাতি মাত্রেই 'নগ্ন' অথবা নাগা। এবং তাহাদিগের আচার ব্যবহারকেই "নাগা-সভ্যতা" বলে। বেদত্রয়ের আবরণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যে সকল তথাকথিত ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর জাতি ভ্রষ্টাচার হইয়া দিন যাপন করিতেছে—তাহারাও এই প্রবন্ধে নাগা নামে অভিহিত হইয়াছে।

কলির প্রারম্ভেই নাগাশক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে এবং বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড সকল ক্রমশঃ লুপ্ত করিয়া ফেলে। কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ পতনোন্মুখ অবস্থায় যাইয়া দাঁড়ায়। বৈদিক-শক্তি-সাধনায় শিথিল-প্রযত্ন ব্রাহ্মণ এবং কুরুক্ষেত্র-যজ্ঞ-ভস্মাবশিষ্ট হীনবীর্য্য ক্ষত্রিয়গণ দুর্দ্ধর্ষ নাগার আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমানে নাগা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বেদ লুপ্ত হইয়াছে। শ্রুতি-স্মৃতির অনুমোদিত ক্রিয়া-কলাপ অর্দ্ধ-নগ্নাবস্থায় আর্য্যসন্তানগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতেছে। ধর্ম্মকার্য্যে অগ্নিমান্দ্য জন্মিয়াছে। ধর্ম্মার্থে

আর সে স্পৃহা নাই। পরলোক আছে—কি নাই, তাহা ভাবিবার অবকাশ নাই। ভাবিতে গেলেও নাস্তিকতা আসিয়া পড়ে। পিতা-পিতামহের শ্রাদ্ধতর্পণের আর প্রয়োজন কি? স্বর্গধামের সহজ পন্থা ৺গয়াধামে বড় দিনের ছুটীতে একবার পদার্পণ করিলেই যখন 'লড্ডুকের' ন্যায় মোক্ষফল হস্তগত হয়, তখন আর পরলোকের ভাবনা কি?

এ বড় মজার ধর্ম্ম—A very short cut to heaven—এক গণ্ডূষ গঙ্গাজল পান করিলেই সকল পাপ চুকিয়া যায়। অতএব আর আমাদের ভাবনা কি? যা খুসী তাই কর। বর্ত্তমান সমাজের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মর্ম্মকথা গেল এই; কাপুরুষোচিত ব্যবহার, কর্ত্তব্য-লঙ্ঘন এবং আত্ম-প্রবঞ্চণা।

শাস্ত্রের বিধান। নানারূপ বিধান ত দুর্ব্বলের পক্ষে। সবলের সম্যক্ অনুষ্ঠান এবং পূর্ণপ্রতিষ্ঠা। কোন নৈয়ায়িক-পণ্ডিতের সহিত কথা হইতেছিল; কালাপাহাড়ের ধ্বংসবাসুদেব মূর্ত্তি দর্শনে হৃদয় দুঃখ এবং ক্রোধে বিদীর্ণ হইতে লাগিল! ভাবিলাম, এই ভগ্ন বিগ্রহের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইতে পারে কি না? ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম—বলিলেন, অঙ্গহীন বিগ্রহ অশাস্ত্রীয়; অতএব ইহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না।

ব্রাহ্মণ! সত্য কহিয়াছ-যতদিন বাসুদেবমূর্ত্তি অঙ্গহীন থাকিবে, ততদিন উহার প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার আমার নাই। খুব সত্য! ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শে বিষ্ণুতেজ উহা হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বিগ্রহ আজ অঙ্গহীন এবং ভূতলাবলুণ্ঠিত। হায়, তবে কি উঁহাতে কখনও আর সে বিষ্ণুশক্তির আবির্ভাব হইতে পারেনা?

'পারে' আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইল—পারে। আব্রহ্মস্তম্ব পর্যান্ত যিনি বিরাজমান, তাঁহার সম্ভাবনা সর্ব্বত্রই। ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রের মর্ম্ম ভুল

বুঝিয়াছ। ঐ বিগ্রহেরই পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইবে। অঙ্গহীনই পুনঃ স্রক্-চন্দনে বিভূষিত হইবে। অঙ্গহীনকেই পূর্ণ বলিয়া বরণ কর। তাচ্ছিল্য করিও না। পূর্ণব্রহ্ম পুরুষোত্তম অঙ্গহীন—ঠুঁটো জগন্নাথ। বিগ্রহ মাত্রেই পূর্ণব্রহ্ম অঙ্গহীন। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত তাঁহার যে প্রতি-রূপ, তাহাও তাঁহার অঙ্গহীন উপলক্ষণ। অতএব, ব্রাহ্মণ ঐ ভগ্নমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার বিধান দেও।

মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার মন্দির চাই। মন্দির কোথায়? ভগ্ন মন্দিরেই সেই দেবতার প্রতিষ্ঠা কর। ঐ শ্মশানেই সেই মহাভীমা, ঘোররূপা মহাশক্তির পূজার আয়োজন করিয়া লও। ব্রাহ্মণ, তুমিই মায়ের পূজক। ঐ মহাপূজা তোমারই কর্ত্তব্য। বিস্মৃত হইও না।

নাগার আক্রমণে মনুষ্যবুদ্ধি অর্থজ্ঞানশূন্য নিত্য-নৈমিত্তিক বৈদিক কর্ম্ম সকল হইতে ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িল। কর্ম্মেরকর্ত্রী বুদ্ধি যদি পরাজিতা হয়, তবে কর্ম্ম করে কে? নাগা সত্য-ধর্ম্মের সন্তানদিগকে বিপথগামী করিয়া ফেলিল। উপধর্ম্ম সত্য-ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিল। কিন্তু কর্ম্মের মূল কখনও উৎপাটিত করিতে পারিল না। জীব হৃদয়গুলি যতদিন থাকিবে, ততদিন কর্ম্ম থাকিবে। ভ্রষ্টাচার সদাচারের স্থান অধিকার করিল, কিন্তু কর্ম্ম বিনষ্ট হইল না।

আজ, আমার জাতি কর্ম্মহীন হয় নাই। কিন্তু অকর্ম্মে বা কুকর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছে। যে কর্ম্মে ইহারা ব্রতী হইয়াছে, তাহা ইহাদিগের পুরুষপরম্পরায় কেহই কখনও অনুষ্ঠান করেন নাই। ইহারা যে কর্ম্ম করিতে পতঙ্গের ন্যায় মৃত্যুমুখে ধাবিত হইতেছে—সে কর্ম্ম বেদে নাই, শাস্ত্রে নাই; জীবে নাই, শিবে নাই। ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে অতিকায় হস্তী পর্য্যন্ত জীব হৃদয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখ, দেখিবে উহারা উহা চায় না।

''বন বর্ব্বরও স্ববশত্ব খুঁজে''

গতিহীন জড় স্থাবর উদ্ভিদ্‌ও উন্মুক্তগগনবিহারী স্বাধীনতার উজ্জ্বল শিখা খুঁজিয়া বেড়ায়। জরাগ্রস্ত গলিত পলিত বৃদ্ধ ও যৌবনের সুখ-স্মৃতি-গন্ধে প্রফুল্লিত হইয়া উঠে। অমৃত কে না চায়? কর্ম্মকে কে না আলিঙ্গন করে? কর্ম্মের উত্তপ্ত শিখায় অমৃত-লুব্ধ শীতার্ত্ত হৃদয়কে কে না সতেজ করিয়া লয়?

কর্ম্মের ভিতর দিয়া জীবের এই অনিবার্য্য গতি রোধ করা যায় না। কোন না কোন কর্ম্ম করিতেই হয়। আজ আমরাও তাহাই করিতেছি। কিন্তু কি করিতেছি? সেই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক অবান্তর কথা বলিয়া ফেলিলাম। পাঠক ধৈর্য্য চ্যুত হইও না।

এত বড় একটা জাতি, কোটিকল্পের তপস্যা লইয়া উন্মার্গগামী হইয়া চলিল, ইহার মূলে যে কি ডাকিনী মায়া খেলা করিতেছে, তাহারই সম্বন্ধে এতক্ষণ হাতড়াইতে ছিলাম।

বৌদ্ধের আক্রমণেই সনাতন ধর্ম্ম-মন্দির ভিত্তিশুদ্ধ নড়িয়া উঠে; ভ্রষ্টা-চারী বৌদ্ধগণই মন্দির-প্রাকার হিমাচল ভূমিসাৎ করিয়া ম্লেচ্ছাক্রমণের প্রবেশ-পথ সহজ করিয়া দেয়। বৌদ্ধই এই ডাকিনী-সভ্যতা দেশবিদেশে লইয়া বেড়ায়। খৃষ্টান্ অথবা মুসলমান্ বৌদ্ধেরই রূপান্তর। অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই জীর্ণ সংস্কার বা পুনরাবির্ভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি এই ভ্রষ্টাচারিদিগের আচার ব্যবহারকেই নাগা সভ্যতা নামে অভিহিত করিয়াছি।

"বর্ত্তমান কর্ম্মযুগ" বক্তার চক্ষে নাগা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। পাশ্চাত্য স্ফীত হইয়া উঠিল, প্রাচ্য ডুবিয়া গেল; তুঙ্গ-শৃঙ্গ-হিমালয় নাগার পদতলে মস্তক অবনত করিয়াছে; বর্ণাশ্রমী ও নাগা ধীরে ধীরে এক হইতেছে; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিশিয়া যাইতেছে। ঋষি-চক্ষে ভারতের দূর ভবিষ্যত অক্ষরে অক্ষরে জাজ্জ্বল্যমান ফুটিয়া উঠিতেছে।

ঋষি যাহা ভারতের ভবিষ্যত দেখিয়াছিলেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হউক। এই অধঃপতির জাতির মর্ম্মে মর্ম্মে ব্রহ্ম-শাপের ছাপ ফুটিয়া উঠুক। খেদ নাই, যাহা সত্য, তাহা আসুক।

তথাপি আমার এই দুর্দ্দমনীয় হৃদয় ঐ অভিশাপের নিকট মস্তক নোয়াইবে না। উহা উন্মুক্তগগন-বিহারী-মুক্ত চিত্তের জন্য নয়। কালধর্ম্ম. যুগধর্ম্ম, আমার হৃদয় মানিতে চায় না। ইহাও ত ব্রহ্ম-সংকল্প। ইহাই যুগবিপ্লবের সূচনা। হৃদয় যখন পর-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চায় না, সাধ্য কি, কেহ তাহাকে দমন করে। মহামায়ার দুরন্ত মায়াও সেখানে পরাজিত হয়। হৃদয় যখন পরধর্ম্ম চায় না, তখন বুঝিতে হইবে, জাতির অন্তস্তলে সুমতির ফল্গু-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। জড়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া জাহ্নবীর ধারা বিপুলতাণ্ডবে ছুটিয়াছে। সহস্র সহস্র মদমত্ত হস্তী উহাতে ভাসিবে ডুবিবে, সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান কর্ম্মযুগে আজ আমি ঐ শক্তির খেলা দেখিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি। ক্ষীণ মৃণাল-সূত্রে ঐ মহাশক্তির আভাস পাইয়া আপদগ্রস্ত ব্রাহ্মণের দুর্ব্বল হৃদয় ও আজ নাগা-বিধ্বংসী চাণক্য ব্রাহ্মণের সতেজ সঙ্কল্প-শিক্ষা ধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

## ব্রাহ্মণের অপমান।

নন্দের সভায় ব্রাহ্মণ অপদস্থ হইয়া অপমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। অতটা ক্ষিপ্ততা আজ এই সাম্যমৈত্রীর যুগে শোভা পায় না, বলিয়াই. সংযমন আবশ্যক। সঙ্কল্প বা উচ্চভাষা ক্ষিপ্ততায় পরিণত না হইয়া, যদি ভাব এবং কার্য্যের পথে পরিচালিত হয়, তাহা হইলেই মঙ্গল।

ব্রাহ্মণ অপদস্থ হইয়াছে। ইহার মর্ম্ম, সংবাদপত্রস্তম্ভে উচ্চনাদে ঘোষিত না হইয়া, ব্রাহ্মণের অন্তরাত্মায় প্রবেশ করুক। ব্রাহ্মণের অপমান দিগ্বিদিকে ঘোষিত হইলে, তাহার বংশের বা ব্রাহ্মণ্যের ইজ্জৎ বাড়ায় না সত্য। ইজ্জৎ বা সম্মান বজায় রাখিতে হইলে, কিম্বা লুপ্ত-গৌরব উদ্ধার করিতে হইলে যে, আত্ম-সম্মানের জাগরণ আবশ্যক, সেই অন্তরাত্মার সহিত ব্রাহ্মণ কি ছিল এবং কি হইয়াছে,—তাহারই সম্মিলন হউক।

হে ব্রাহ্মণ! এই উদ্দেশ্যে তোমাকে লক্ষ্য করিয়া, অপ্রিয় নিন্দাবাদ করায়, যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, তাহার যাহাতে প্রশমন হয়, আমাকে সেই ভিক্ষা দাও।

কোন ব্রাহ্মণকে তাহার শ্বেতাঙ্গ প্রভু পদাঘাত করিয়াছিলেন। এ ঘটনা সত্য এবং বহুদিনের। সংবাদ পত্রে ইহার সমালোচনা এবং আবেদন-নিবেদন অনেকই প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ অপমানিত হইয়া, ইজ্জতের দাবীতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।

ব্রাহ্মণের এই লুপ্ত-গৌরব-উদ্ধার-প্রয়াস-পদ্ধতিতে অনেকে হর্ষিত এবং অনেকে বিমর্ষিত হইয়াছিলেন। আত্ম-বিস্মৃত ব্রাহ্মণ যে প্রতীকারের পন্থা খুঁজিয়া লইলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বা

আশ্চর্য্য কিছুই নয়। অন্তরাত্মায় যে আত্ম-সম্মান উদ্ধার করিবার শক্তি লুকায়িত রহিয়াছে, অন্ধ ব্রাহ্মণ তাহার সন্ধান পাইলেন না। কাহার দোষ? নাগা পূর্ব্বেই দৃষ্টি দূষিত করিয়া ফেলিয়াছিল। আত্ম-সম্মানের মস্তক ইতঃপূর্ব্বেই এই দুরন্ত ছাগ কর্ত্তৃক চর্ব্বিত হইয়াছিল। আবেদন-নিবেদনের ডালা সাজাইয়া ব্রাহ্মণ যে সম্মানের ভিখারী হইলেন, সে সম্মান তাহার লাভ হউক, বা নাই হউক, চিত্তের ক্ষোভ অনেকটা কমিয়া গেল।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

নারায়ণ ব্রাহ্মণের কামনা পূর্ণ করিলেন। বৎসরের প্রথম ফল নারায়ণকে অর্পণ করিয়া, বর্ণাশ্রমী আর্য্য পরে তাহা আত্ম-প্রীত্যর্থে গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ-দম্পতীর অন্তরে পুত্রের সঞ্চার হইবার পূর্ব্বেই তাহারা উহাকে অভদ্রে অর্পণ করিয়া রাখে। নারায়ণকে প্রণাম করিয়া উহারা প্রার্থনা করে,—"ভগবন্, এই ফল আসুরীসেবায় অর্পণ করিলাম।" নারায়ণ সেই কামনা পূর্ণ করিলেন। এ জাতির কামনা আজ এই ভাবেই পূর্ণ হইতেছে।

আত্মা কল্পবৃক্ষ। যে যাহা প্রার্থনা করে, তাহাকে তাহাই প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ অর্থ প্রার্থনা করিতেছেন। ধর্ম্ম প্রার্থনা করিতেছেন না। অর্থলাভ হইতেছে। পুত্র জন্মিল। ধর্ম্মার্থে সে উৎসর্গীকৃত হইলনা। শিক্ষা দীক্ষা নাগার হস্তে পড়িয়া ভাসিয়া চলিল। পিতা, মাতা পুত্রের নিকট সেবা বা ভক্তি কিছুই আকাঙ্খা করিলেন না। চাহিলেন—অর্থ। বৃদ্ধ পিতামাতা কোথায় পড়িয়া রহিলেন। পুত্র দেশান্তরে—পরপদ সেবায় জীবনাতিবাহিত করিতে লাগিল। ধর্ম্মের অবিরোধে পুত্রের ভাগ্যে আর অর্থোপার্জ্জন ঘটিল না।

শাস্ত্রের ব্যবস্থাপক এবং অধ্যাপক বহু ব্রাহ্মণের সহিত এ প্রসঙ্গ অনেক হইয়াছে। কিসে এ আধিব্যাধির প্রতীকার হয়। কেহই যথোচিত উত্তর দিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ, বলিলেন কালধর্ম্ম মানিয়া চলিতে হয়। সহ্য হইলনা। প্রত্যুত্তর দিলাম--কালধর্ম্ম মানিয়া চলিতে গেলে, মেষ শাবক হইয়া থাকিতে হয়।

ব্রাহ্মণ, তোমার যুগধর্ম্ম—কালধর্ম্মে ত্রিশকোটী লোক মেষত্ব প্রাপ্ত হইয়া আছে। কি করিয়া তাহাদের উদ্ধার হইবে? ব্রাহ্মণ বল্লেন, ভ্রষ্টাচার প্রতিষেধ কর।—বাকীটা কে করবে? কালের পায়ে ঢেলে দাও। বুঝিলাম—ব্রাহ্মণ ভীত হইয়াছেন; দুর্ব্বল চিত্তে তেজের যথেষ্ট অভাব হইয়াছে। কালের স্ফটিক-স্বচ্ছ দর্পণে, স্বকীয় প্রতিবিম্ব সন্দর্শনে, অহঙ্কার-সিংহ কখন আত্ম-গ্রাসের নিমিত্ত লাফাইয়া পড়িবে, সে সময় ব্রাহ্মণের এখনও আসে নাই। উহার চিত্ত-শশক এখনও সে চৌর-সিংহের সন্ধান জানেনা বলিয়াই, ব্রাহ্মণ অতটা পশ্চাৎপদ। অতএব বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন।

কালস্রোতে জাতিধর্ম্ম সব ভাসিয়া চলিয়াছে। স্রোত প্রতিরোধের নিমিত্ত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড কালগর্ভে নিক্ষেপিত হইতেছে, তাহাতে স্রোত রুদ্ধ হইতেছে না সত্য, কিন্তু উহাকে ক্ষণেক থমকিয়া দাঁড়াইতে হইতেছে। লোষ্ট্রখণ্ড স্রোতের সহিত যতদুর অপসারিতই হউক না কেন, উহাদিগকে বক্ষ হইতে সরাইতে পারিতেছে না। প্রেরণা কখনও নিস্ফলে আসে না। পুষ্পাঞ্জলি স্রোতের সাথে নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, সাগর-কোলে মিশাইয়া যায়। অনন্ত সাদরে উহা বক্ষে ধারণ করেন।

কালস্রোত রুদ্ধ হইবে। খণ্ডকাল মহাকালে বিলীন হইবে। যুগে যুগে মিশিয়া মহাযুগে পরিণত হইবে। চিত্তভূমি পরিষ্কৃত হইবে। অমৃতধারা বর্ষিত হইতে থাকিবে। নূতন মানুষ আসিয়া নূতন যুগ স্থাপন করিবে।

তৈল বিন্দু জলে পতিত হইল। দেখিতে দেখিতে সরসীবক্ষ ছাইয়া ফেলিল। অবশেষে নদীগর্ভে কোন এক নিরুদ্দেশ দেশে অদৃশ্য হইয়া গেল, কেহ জানিল না। বেদবিধ্বংসী দুষ্টাশক্তিও তৈল বিন্দুবৎ বিলীন হইবে। ব্রাহ্মণ্য-শক্তি, পর্ব্বত পাষাণকেও অবনত করিয়াছে। বহু যক্ষ-রক্ষ-অসুরকেও জীর্ণ করিয়াছে। বৌদ্ধকে গ্রাস করিয়াছে। মুসলমান পরাস্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টান হার মানিয়াছে। মুসলমানের মোল্লামসজিদের পশ্চাতে তরবারি ছিল! খ্রীষ্টানের গির্জ্জাপাদরীকে বিপুলকোষ ও বন্দুক সতত সজীব রাখিয়াছে।

ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করে কে?—স্বয়ম্ভূ সনাতন ধর্ম্ম আপনিই আপনাতে সতত সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কত যুগ, কত যুগান্তর, কত বিপ্লব, কত অত্যাচার—ইহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। আজও ব্রাহ্মণ-কুমার শিখা-সূত্র-যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করে নাই। যুগ যুগান্তের সেই উপলক্ষণ, এখনও ঐ দেহে জন্মজন্মান্তরে ফুটিয়া উঠিতেছে। ব্রাহ্মণ্য শিখা-সূত্রে অবস্থান করে না সত্য! তথাপি উহা বড় আদরের। আমি ঐ চিহ্ন ধারণ করিয়া ব্রহ্মার মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছিলাম। অনাদি অনন্ত কাল হইতে ঐ সূত্ররেখা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছে। উহাতে বিজ্ঞান দর্শন থাকুক, আর নাই থাকুক, উহা বহু পুরাতন। উহাতে কুসংস্কার বা সুসংস্কার, যাহাই থাকুক না কেন, উহা আমার অতীব গৌরবের স্মৃতিশিখা—উহা আমার, আর কাহারও নয়।

সুবাতাস বহিয়াছে; যে উত্তেজনায় ব্রাহ্মণসন্তান শিখাসূত্র ছিড়িয়া ফেলিয়া বৌদ্ধ, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান সাজিতেছিল, সেই উত্তেজনার তেজ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। কালচক্রের গতি বুঝি বা ফিরিল। ভারতের ভাগ্যচক্র বুঝিবা পরিবর্ত্তিত হইল। অতি

অল্প সময়ের মধ্যেই নাগা-সভ্যতার অসারত্ব লোক চক্ষুতে ধরা পড়িয়াছে। সহস্র-শীর্ষ পুরুষ ডাকিনা মায়ার দুর্ভেদ্য-রহস্য ভেদ করিতে পারিয়াছেন। সহস্র চক্ষু সহজেই ঐ মায়া-দুর্গের নির্গম-পথ দেখিয়া লইবে।

## ( ১০ )

## নাগা-সভ্যতা

সমগ্র ইউরোপ আমেরিকা ধুতি চাদর পরিলে প্রাচ্যও যেমন একদিন হাসিতে পারে, সেইরূপ ইউরোপীয়-আমেরিকান্ পাশ্চাত্য জাতিসমূহ হ্যাটকোটধারী প্রাচ্যের দিকে তাকাইয়া হাসিতে থাকে; এবং মনে করে পাশ্চাত্যের আচার ব্যবহার বেশভূষা সকলই সুন্দর, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই যেন সমস্ত জগৎ উহা গ্রহণ করিতেছে। প্রাচ্য খোলস বদলাইয়া যেন মনুষ্যত্ব মুমুক্ষত্ব উভয়ই লাভ করিয়াছে। প্রাচ্য যে 'দিল্লীকা লাড্ডুর' লোভে পস্তাইতেছে, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে প্রাচ্য কখনও উজান্ বহিয়া যাইতেছেনা। পাশ্চাত্যের যাহা Progress বা উন্নতি, প্রাচ্যের তাহা অবনতি। পাশ্চাত্য, তাহার উন্নতির শেষ পরিণাম কি ভাবে দাঁড়াইবে, তাহা বুঝিতে পারে না; প্রাচ্য তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে।

গোটাকত কলকারখানা এবং মনুষ্যপশুপক্ষীকীট-নিষ্পেষণযন্ত্র আবিষ্কার দ্বারা মানবত্বের আদর্শ-স্থান অধিকার করা যায় না। জোর করিয়া সে স্থানে চাপিয়া বসিলেও 'ধুপ্' করিয়া খসিয়া পড়িতে হয়।

এই কর্ম্মভূমে মুসলমানও একবার ভোগের হাট বসাইয়াছিল। কত বরফপানি, গরমখানার জোয়ার বহিয়াছিল। কত দালান এমারত মোল্লা মসজিদ উঠিয়াছিল। জাহ্নবী যমুনার ক্ষীণ সলিল রেখায় এখন তাহার ছায়া মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। যিনি এইসকল ক্রীড়নকগুলি লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন—তিনি লোক-ক্ষয়কারী মহাকাল্—অদ্বিতীয় ভারত-ধর্ম্মরাট্। মুসলমান সভ্যতার সেই

বালির বাঁধ নবদ্বীপাবতারের প্রবল হরিনাম বন্যায় কোথায় ভাসিয়া গেল। অত্যাচার অবিচার হরিনামগর্ভে ডুবিল। মুসলমান "কাফেরকে" ত নির্ম্মুল করিতেই এতদিন চেষ্টা করিয়াছে। কই তাহা ত হইল না? হরিনাম প্রবাহে মদমত্ত ঐরাবত হাবু ডুবু খাইয়া ভাসিয়া চলিল।

মুসলমানের সহিত বেচা কেনায়—ভারত দিয়াছিল বেশী, গ্রহণ করিয়াছিল কম। পর্ব্বত প্রাকার উল্লঙ্ঘন করিয়া ম্লেচ্ছ-নিবহ ভারত-ক্ষেত্র ভাসাইয়াছিল। যাবনিক ভাষা, যাবনিক আচার, যাবনিক ব্যবহার বিপুলাবর্ত্ত সৃজন করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। বহু-জয়চন্দ্র, মানসিংহ, জগৎশেঠ হাবু ডুবু খাইয়া উঠিলেন। তখনও আমার পূর্ব্বপুরুষগণ যে এই পূত যজ্ঞ-সূত্রশিখা পরিত্যাগ করেন নাই, সেই হট্টগোলে যে আমার পিতামহগণ তখনও জীবনের মূলমন্ত্র 'সবিতুর্ব্বরেণ্যং' বিস্মৃত হন নাই, ক্ষীণ দেহে এই যজ্ঞসূত্রই আজ তাহার প্রমাণ।

এই যে বিপুল মুসলমান জনসংঘ দেখিতে পাইতেছ, উহারা কেহই 'মক্কামদিনা' হইতে আইসে নাই। যাহারা আসিয়াছিল, মোগল লক্ষ্মীর সাথে সাথেই তাহারা অন্তর্ধান হইয়াছে। ঐ গঙ্গাগর্ভেই মুসলমান রাজশ্রী নিমজ্জিতা হইয়াছেন। রাজশ্রী লইয়া যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা চলিয়া গিয়াছে; এখন আছে শুধু কতকগুলি হতভাগ্য—বাঙ্গলার মাঠের মাটী খুড়িয়া, এক্কা হাঁকাইয়া, চার পেয়ালা লইয়া ছুটাছুটী করিয়া প্রাণপাত করিতেছে; উহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ আমাদের সাথে এই বর্ণাশ্রম পাদপের শীতল ছায়ায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল; জোর করিয়া যবনরাজ উহাদিগকে আরবের মরুভূমির দগ্ধ বালুকায় নিক্ষেপ করিলেন। হতভাগ্যগণ হতাশস্বরে 'হাসেন্ হোসেন্' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। আজও সে

আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতেছে। উহারা বর্ণাশ্রম পাদপ হইতে ছিন্ন হইয়া পরগাছার ন্যায় দিন যাপন করিতেছে।

মুসলমান-রাষ্ট্র বিপ্লবে যে সমাজ ও ধর্ম্ম বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে সমাজের অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে সত্য, সেই ঝঞ্ঝাবাতে বর্ণাশ্রমবৃক্ষের বহু শাখা প্রশাখা ভগ্ন হইয়াছে সত্য; কিন্তু অতল-স্পর্শী পাদপমূল উৎপাটীত হয় নাই। দেখিতে দেখিতে মুসলমানের দিন ফুরাইয়া আসিল।

ইংরাজ মুসলমানের হস্ত হইতে শাসনদণ্ড কাড়িয়া লইল। ইংরাজের ব্যবস্থায় সমাজে এবং ধর্ম্মে একটা বাহ্যিক শান্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল। খৃষ্টানগণের হস্তে আর সমাজকে অতটা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল না। ইংরাজ-রাজের সম-দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান সমান স্থান অধিকার করিল। ইংরাজ একতার নিশান তুলিয়া দিল। একবার টোটা দাঁতে কাটাইতে যাইয়া বুহু ইংরাজের টুটী কাটা পড়িয়াছিল বলিয়াই সুচতুর ইংরাজ-রাজ ঠকিয়াই এই সাম্যভাব শিখিয়া লইলেন।

আজ সমাজ এবং ধর্ম্ম যেন একটা শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। রাজার উদার চক্ষে ইহাদিগের অভাব অভিযোগ কিছুই নাই বলিয়াই বোধ হয়। আগ্নেয়গিরির রসায়ন-স্পন্দন প্রথমে কেহই অনুভব করিতে পারে না। ভূগর্ভ নিহিত বিস্ফোরকগর্জ্জন সহজে কেহ শুনিতে পায় না।

ইহাদিগের অভাব অভিযোগ অনন্ত। দুরন্ত নাগা-সভ্যতা বর্ণাশ্রম ভিত্তি মুষিকের ন্যায় খনন করিয়া ফেলিতেছে। রাজ-শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ অপচয় নিরাকৃত হইতে পারে না। রাজশক্তি ব্যতীত বর্ণাশ্রম সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুরক্ষিত থাকিতে পারে না। ইংরাজের অধীনস্থ প্রজাদিগের মধ্যে, বর্ণাশ্রমাচারী প্রজাবৃন্দই অধিকতর বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। উহাদের ধর্ম্ম এবং আচারই বর্ত্তমান

কর্ম্মযুগ-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। প্রজার ধর্ম্ম এবং আচার রক্ষা করিতে হইলে রাজাকেই করিতে হয়। দুর্ব্বল প্রজা এই বহুশক্তি-সাধ্য-ব্যাপার কি করিয়া সম্পাদন করিবে? দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, ইহাই রাজ-ধর্ম্ম।

ইংরাজ যতদেশেই জমীদারী তশীলদারী করিয়া বেড়াইয়াছে, তন্মধ্যে ভারতই শ্রেষ্ঠ। ভারতের নানাবর্ণ প্রজার মধ্যে বর্ণাশ্রমী প্রজাই শিষ্ট। এ বিষয়ে কোন দ্বিরুক্তি নাই। ইহারা রাজাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করে। আইনকে বেদের ন্যায় সম্মান করে। এইরূপ শিষ্টাচারী প্রজার ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা করা সর্ব্বতোভাবে রাজারই কর্ত্তব্য।

ইংরাজ ভারত অধিকার করিয়া এই দেশের আচার ব্যবহারের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে নাই বটে, কিন্তু চতুর্দ্দিক হইতে নাগা-সভ্যতার যে ভ্রষ্টাচার-স্রোত আসিয়া বর্ণাশ্রম ভাসাইয়া দিল, তাহা রোধ করিতে না পারিলে, বর্ণাশ্রম যে আর রক্ষা পায় না! একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। অর্থহীন শক্তিহীন প্রজা উহা কি করিয়া রোধ করিবে? ইংরাজ উহা করিতে পারে। কারণ রাষ্ট্র, কোষ, দণ্ড—ভারতের সর্ব্বস্বই, ইংরাজের নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙ্গালী তাহার মঙ্গলামঙ্গল, মান সম্মান, ধর্ম্মঅর্থ, আচার ব্যবহার, সর্ব্বস্বই ইংরাজের হাতে তুলিয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালার সাথে সাথে সমগ্র ভারতই—ইংরাজকে সর্ব্বস্ব রক্ষার ভার দিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন—

যখন জাগ্রত হইয়া উহারা ন্যস্তধন ফিরাইয়া চাহিবে, তখন দুর্গরক্ষক ইংরাজ কি প্রত্যর্পণ করিবে? যখন ভারত জাগ্রত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবে—আমার "ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ" কোথায়? তখন এই বর্ণাশ্রম দুর্গের প্রহরী ইংরাজ কি উত্তর দিবে?

# ( ১১ )

## নাগা সভ্যতা

পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম মাত্রই এই বিশ্বজনীন সার্ব্বভৌম সনাতন ধর্ম্মের প্রতিধ্বনি—দূর দূরান্তরে ঘুরিয়া ফিরিয়া, এই উৎপত্তি স্থানে বিলয় হইতেই যেন আবার ছুটীয়া আসিতেছে। ভারতের হাটে ধর্ম্মের মেলা বসিয়াছে। নানা ধর্ম্ম, নানা বর্ণ আসিয়া মিলিয়াছে। যাহার পসরায় যাহা ছিল, তাহার যাচাই হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ-নাগা দোকান পসার গুটাইয়া চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার হাটের গরমে পেশোয়ারী আঙ্গুর পচিয়া উঠিয়াছে। স্বর্গ নরকের ছবি—পিতা পুত্রের খেলনা—দু একটা করিয়া বালকেরা কেহ কেহ বা ক্রয় করিতেছে। ইহাতেই কেহ বা জগৎ জোড়া দোকান খুলিয়া এখনও বসিয়া আছে, এবং লাভ লোকসানের খতিয়ানের পৃষ্ঠা বাড়াইয়া জগতের উন্নতি অবনতির চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হইতেছে।

হে ঈশ্বরের প্রিয় পুত্রগণ, একবার ভাবিয়া দেখ, জগৎ কোথায় যায়? পৃথিবী দিন দিন তরুণা হইতেছে, না বৃদ্ধা হইতেছে? সূর্য্যের উত্তাপ ক্রমশঃ বাড়িতেছে, না কমিতেছে? ঐ জড়পিণ্ডটা শীতল হইয়া কবে পৃথিবীর মাথায় খসিয়া পড়িবে, বিজয় শিঙ্গা কবে বাজিবে, —মানবজাতি পরীর ন্যায় পাখা ধরিয়া কবে আকাশে উড্ডীয়মান হইবে—একবার আমাকে তোমাদের এই জগতের পরিণামটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেও।

হে দার্শনিক—তোমার চারুচিক্কণ শিল্পকলা পরিপূর্ণ সুদৃশ্য গ্রন্থে কত থিয়োরীরই (Theory) না অবতারণা করিয়াছ—হে কবি

One Law, One God—কতনা কিছুই ভবিষ্যের পৃষ্ঠায় দেখিয়া গিয়াছ! একবার আমাকে সেই ভবিষ্যতটা দেখাইয়া দেও।—মহা-মায়ার লীলা বৈচিত্র্যে উঠিয়া যাইবে! সাদা কাল মিশিয়া ধোঁয়া হইবে! বিশ্ব প্রেমের জোয়ার বহিতে থাকিবে! এবং তোমরা তাহার-বৈজয়ন্তী বাহী হইয়া জগৎ মাতাইয়া তুলিবে—মূঢ় চিত্ত।

তোমাদের পাঠশালে জীবনটা কাটাইয়া দিলাম! তোমাদের দর্শন বিজ্ঞান পড়িয়া বুড়িয়ে গেলাম! কিছুইত বুঝিতে পারিলাম না! যদি শুনিতে চাও, শেষ কি বুঝিলাম—

"East is East, and West is West,
And the two ends shall never meet"

প্রাচ্য প্রাচ্যই থাকিবে—পাশ্চাত্য পাশ্চাত্যই থাকিবে—উভয়ের কখন মিলন হইবেনা। বর্ত্তমান কর্ম্মযুগের লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। জাতি ও বর্ণ-বৈচিত্র্য কখনও মিশিয়া যাইতে পারে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কখনও মিলিতে পারে না। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের গর্ভে প্রবেশ করিলেও দৈত্য-গুরুর ইঙ্গিত মাত্রই উহার গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া অচিরাৎ নিষ্ক্রান্ত হইবে। পাশ্চাত্য প্রাচ্যের উদরে প্রবেশ করিলে বাতাপীর ন্যায় জীর্ণ হইয়া যাইবে।

স্বাকার করি, আটলান্টিকের মহোচ্ছ্বাসের ন্যায় পাশ্চাত্যের প্রচণ্ড বাসনা উচ্ছ্বাস প্রশান্ত প্রাচী-দিঙ্মণ্ডল আলোড়িত করিয়াই যেন প্রবাহিত হইতেছে। প্রাচ্য ঐ প্রবল ঝটিকার তুমুল তাণ্ডবে ব্যথিত ও মুহূর্মুহুঃ বিকম্পিত হইতেছে। বজ্র-বাঁটুলেরবাজ বুদ্ধ-সন্তান চক্রবাল-রেখা উষার ঈষৎ অরুণ রাগে রঞ্জিত করিয়া প্রবল ঝঞ্ঝায় যেন অবসান যেন সূচনা করিতেছে। প্রাচ্য হাসিল। দেখিতে দেখিতে দিঙ্মণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

ভারত, তুমি কি হাসিবে না? নিশার গভীর আঁধার ভেদ করিয়া জ্ঞান-সূর্য্য কি তোমার গগনে আর উদিত হইবে না?

জ্ঞান গৌরবের নাভিচক্র ভারতের গতি যদি রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে জগচ্চক্র রুদ্ধ হইবে। ভারত যদি ভোগের স্রোতে ভাসিয়া যায়, সনাতন ধর্ম্ম যদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, বর্ণাশ্রম যদি একবারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে আমি ব্রাহ্মণ আর্য্য-সন্তান ভারতবাসী, আমার বলিয়া আর থাকে কি? পুরাতন বলিয়া আর গৌরবের স্থান কিছুই থাকে না।

আজ বাসনার স্রোতে নিবৃত্তি-পরায়ণ ব্রাহ্মণ গা ঢালিয়া দিয়াছে। নূতন লইয়া মাতিয়াছে। পতঙ্গের ন্যায় আগুন লইয়া খেলা করিতে বসিয়াছে। যাহা সৌম্য, যাহা শান্ত, আড়ম্বর হীন, যাহা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় বাহিরে নিতান্ত দীন, ভূগর্ভ নিহিত রত্ন-খনির ন্যায় ভারতের সেই প্রচ্ছন্ন বৈভব, মুগ্ধ-পতঙ্গ সকল দেখিতে পাইতেছেনা। আবহমান কালের শিক্ষা দীক্ষা বিস্মৃত হইয়া পতঙ্গ-প্রাণ মানব সকল বিষয় লালসায় দিগ বিদিক ধাবিত হইতেছে।

কিসে এই গড্ডালিকা স্রোত রুদ্ধ হইবে, কোন আকর্ষণী মন্ত্রশক্তি-বলে এই বধির জনতা নিবৃত্তির পথে ফিরিয়া আসিবে, সেই চিন্তায় আজ নিবাত নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায় কর্ম্মযোগীর আত্মা ধ্যানস্থ, জাতীয় মুক্তি-মন্ত্রসাধনায় সমাধি মগ্ন।

( ১২ )

## নাগা-সভ্যতা

বৌদ্ধ মুসলমান এবং খ্রীষ্টান, এই যুগত্রয়ে সনাতন ধর্ম্মের সঙ্কোচ কাল বিভক্ত। বৌদ্ধের আক্রমণে সত্যধর্ম্মানুমোদিত বৈদিক ক্রিয়াক্রাণ্ড বিলুপ্ত হইল। মুসলমানের আক্রমণে মন্দির-মুকুট খসিয়া পড়িল। বর্ত্তমান কর্ম্মতাণ্ডবে বিগ্রহশুদ্ধ নড়িয়া উঠিয়াছে। অন্তরাত্মা মুহুর্মুহু কম্পিত হইতেছে। বুদ্ধি কলুষিত হইয়াছে। সত্যে অসত্য ও সর্পেতে রজ্জু-ভ্রমে, ইহারা তাহাই আকর্ষণ করিতে ছুটিয়াছে। কলিকলুষান্ধ জীবনিবহ মুক্তি-পরিপন্থী কার্য্যে ব্রতী হইয়া আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছে। উচ্ছৃঙ্খল যুবকবৃন্দ ধর্ম্ম এবং সমাজের শাসন হইতে বহির্গত হইয়া আপনাদিগকে স্বাধীন কল্পনা করতঃ বিমুগ্ধ হইতেছে। স্বেচ্ছাচারিতা কখনও স্বাধীনতা নহে। প্রবল বাসনা এবং তদনুকূল প্রলোভনের দুর্নিবার স্রোতে ধাবমান শুষ্ক-তৃণ-গুচ্ছ যদি মনে করে, সে আপনার বেগে আপনি ধাইতেছে, তাহা হইলে তাহাকে নিতান্ত ভ্রান্ত বলিতে হইবে। আজ কাল এ জাতির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণও ঠিক সেইরূপ; প্রলোভনে পড়িয়া অলস অবশ ভাবে যাহা করিতে বাধ্য হয়, তাহাতে নিজের অহঙ্কার বিজৃম্ভিত কর্ত্তব্য বুদ্ধি আরোপ করিয়া আরও বিমুগ্ধ হয়, এবং সেই সকল পথে অপরকে পরিচালিত করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ বোধ করে না।

নূতন আদর্শ, নূতন মানব, নূতন সভ্যতার সহিত ভারতের সংঘর্ষ উপস্থিত। নূতন ধ্যান, নূতন ধারণা, নূতন কার্য্য ইহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। ভারত তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে।

এই বাধ্য-বাধকতা কোথা হইতে আসে? একটা দেশ কিম্বা একটা জাতি, যে পরের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, পরাভূত দেশ এবং জাতিতে যাহারা উচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকে, তাহারা পরের আচার ব্যবহারগুলিকে শ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করে। এতদ্দেশে ব্রাহ্মণ জাতি প্রধান ছিল, তাহাদের দৃষ্টান্তে অপরাপর জাতি পরিচালিত হইত। ব্রাহ্মণ যে ব্যবস্থা দিতেন, ব্রাহ্মণেতর জাতি তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিত। কালে ব্রাহ্মণের সে সম্মান খর্ব্ব হইয়া আসিল। ব্রাহ্মণ অপদস্থ হইলেন। ধর্ম্ম ম্লান হইয়া পড়িল। জাতি সকল উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইল। তাই আজ সমাজের এই অবস্থা।

আজ ব্রাহ্মণ জাতির অতীব দুর্দ্দৈব উপস্থিত। সত্যের কষ্টিপাথর-ব্রাহ্মণে আজ সত্যের দাগ স্পষ্টরূপে ফলিয়া উঠিতেছে না। স্বধর্ম্ম-পালন-পরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ ভ্রষ্টাচার হইয়া দিন যাপন করিতেছে। তাহাদের মতিগতি আবার স্বধর্ম্মে ফিরিবে কি না, তা' বলিতে পারি না। যাঁহার অঙ্গুলীসঙ্কেতে তাহাদের মতিগতি ধর্ম্মপথে ফিরিয়া আসিবে, তাঁহার আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত হয়ত ব্রাহ্মণগণকে এই ভাবেই অবস্থান করিতে হইবে—কেহ বা উদ্ধত স্বভাব শৌচাচার বিহীন হইয়া ম্লেচ্ছের ন্যায় দিন যাপন করিতেছেন। কেহবা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। আপনার ধর্ম্ম কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিলে পরের নিকট মুখ হেট্ করিয়া থাকিতে হয়—তাহাই বা কাহারও কাহারও, হইয়াছে। এই অভিনব সংগ্রামে ব্রাহ্মণের যে হার হইয়াছে, তাহার আর বিশেষ প্রমাণ-প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে তাঁহার অধঃপতন হইয়াছে।

সমাজের মুকুটমণি ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইতেছে। ব্রাহ্মণেতর জাতি সকল ব্রাহ্মণের অধঃপতন হইয়াছে বলিয়া উচ্চহাস্য করিয়া বেড়াইতেছে। আর্য্যেতর জাতি সকল ব্রাহ্মণের অধঃপতনে আপনাদিগের বিজয়-ঢাক বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। শাস্ত্রপুরাণ উচ্চনাদে বহুদিন পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়া রাখিয়াছেন—যে ব্রাহ্মণের অধঃপতন হইবে, আজ তাহাই হইয়াছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অভিশাপই যেন ব্রাহ্মণের মস্তকে আসিয়া পতিত হইয়াছে। আমি সেই ব্রাহ্মণ, আজ সমগ্র জগতের অভিশাপ মস্তকে লইয়া, এই কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। একদিকে প্রবল প্রতাপ দুর্দ্দান্ত কলির যথেচ্ছাচার শাসন ও প্রলোভনের বন্যায় জাতি ধর্ম্ম-কর্ম্ম শুষ্ক তৃণগুচ্ছের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে। অপর দিকে বহু জন্ম এবং বহু পুরুষ-সিদ্ধ-স্বভাবের প্রতি স্বধর্ম্মের আকর্ষণ--ভোগ এক দিকে আপনার বিলাস-বিভ্রম দেখাইয়া চিত্তকে মুগ্ধ করিতেছে, অপর দিকে নিবৃত্তি সুদূরে অমৃত ভাণ্ড লইয়া অপেক্ষা করিতেছে—ব্রাহ্মণ-যুবক মধ্যস্থ হইয়া এই উভয়-শক্তির সংগ্রাম সন্দর্শন করিতেছেন। কে জয়ী হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই।

পাপ পুণ্যের সংগ্রামে, সত্য অসত্যের সংগ্রামে, দেবাসুরের সংগ্রামে, দেবতাই জয় লাভ করিয়া থাকেন। পুণ্য এবং সত্যই পরিশেষে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পাপের ত্রিভূবন-বিজয়িনী ক্ষমতাকে পর্য্যুদস্ত করিয়া সত্যের অপরাজিতা শক্তি অচিরাৎ প্রাধান্য লাভ করে। ব্রাহ্মণের হৃদয়ে আজ যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, ধর্ম্ম কর্ম্ম শৌচাচার-হীন আত্মবিস্মৃত ব্রাহ্মণ যে পদে পদে অপদস্থ হইয়া ঘৃণিত অবস্থায় কাল যাপন করিতেছে, সে লাঞ্ছনা সে সংগ্রামের কি শেষ হইবে না? কর্ম্মের বিষাণ ও ধর্ম্মের বিজয়ভেরী কি আর বজ্র গম্ভীর নির্ঘোষে আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া গর্জ্জিয়া উঠিবে না? সত্যের

বিজয়-বৈজয়ন্তী কি আর প্রতি সৌধ-মন্দির চূড়া সুশোভিত করিয়া উড়িতে থাকিবে না? থাকিবে। ঘোর অমানিশার স্থূল স্থচীভেদ্য অন্ধকারপিণ্ড ভেদ করিয়া নক্ষত্রের ধ্রুব জ্যোতি পৃথিবীতে অবতরণ করে। প্রলয় ঘনঘটার সুগভীর তিমির তরঙ্গে চঞ্চলদামিনী হাসিতে হাসিতে নৃত্য করিয়া থাকে। ঐ চকিত চাহনিতে সত্যানুসন্ধিৎসুহৃদয় আশার ক্ষীণ মৃণাল সূত্রের সন্ধান পাইয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠে। এই জয়-পরাজয় আশা-নিরাশার খেলায় ব্রাহ্মণোচিত ধৈর্য্যের প্রয়োজন। ধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতে হইবে। সমাজের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জীর্ণ শীর্ণ বিশুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। যাহাতে আবার রক্ত মাংসমেদ মজ্জার সংযোগ হয় তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে মরণোন্মুখ জাতির শিরায় শিরায় আবার প্রাণের তড়িৎ-স্পন্দন প্রবাহিত হইবে। বালক বৃদ্ধ যুবক আবার সকলে মিলিয়া সেই পুরাতনী সাধনায় ব্রতী হইবে। সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইবেই হইবে।

সাধনা করিলে, সিদ্ধি লাভ হয় না—একথা বিশ্বাস করিতে পারি না। এ জাতি যাহা আকাঙ্খা করিয়াছে, তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছে। একদিন "অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" কামনা করিয়াছিল, জাতীয় শিক্ষা দীক্ষা শৈশব হইতে সেইরূপ ভাবেই গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন ম্লেচ্ছের ন্যায় শৌচাচার বিহীন হইয়া থাকিতে কামনা করিতেছে। শৈশব হইতে ইহাদের শিক্ষা দীক্ষা ও সেইরূপ ভাবে পরিচালিত হইতেছে। দেশে সমাজে ভ্রষ্টাচার প্রবেশ করিয়া জাতি ধর্ম্ম উৎসন্ন করিয়া দিয়াছে। যেই এই কুশিক্ষা জীবনের ব্রত বলিয়া অবলম্বন করিল, বালকগণ ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্ট হইয়া দিবানিশি জাতি-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ শিক্ষায় জীবনপাত করতঃ আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিল। যে যাহা কামনা করে, নারায়ণ তাহাকে তাহাই প্রদান করেন।

ইহারা আর সেই জাতীয় শিক্ষা চাহে না, তাই পায় না। দোষ কাহার? এ অধঃপতনের জন্য দায়ী কে! যাহাদের অধঃপতন হইয়াছে, তাহারাই। স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিতে এই দায়ীত্ব বোধ আবার ফিরিয়া আসুক। ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণকেই দায়ী করিবেন। এই অধঃপতনের জন্য ব্রাহ্মণের উপর অজস্র গালি বর্ষণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ অস্বীকার করে না যে. সে সমাজ এবং ধর্ম্মের জন্য দায়ী। ব্রাহ্মণ এই দায়িত্ব জ্ঞান হারাইয়া এতদিন 'কিম্ভূত-কিমাকার' অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল। আজ তাহার সেই দায়ীত্ব বোধ ফিরিয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্মণ জাগিয়াছে। ব্রাহ্মণের আহ্বানে এই প্রসুপ্ত সমাজ কি পুনঃ জাগ্রত হইবে না।

## "ব্রাহ্মণের তপস্যা"

জাতি-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ শিক্ষায় এবং সভ্যতায় জাতি ধ্বংস হইতে থাকে। বিজাতীয় ধ্যান-ধারণায় জাতির চিত্তবৃত্তির কখনও বিকাশ হইতে পারে না। বিজাতীয় বেশ ভূষা, আচার ব্যবহার এবং আহার বিহারে জাতির স্বাস্থ্য ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায়। স্বাস্থ্য এবং চিত্তের বিনাশ যুগপৎই সংঘটিত হইয়া থাকে। পাপ ও পারা হজম করা যায় না। ব্যভিচারের ফল শরীরে ধীরে ধীরে ফলিয়া উঠে। তেমনি আমাদের বর্ত্তমান সমাজে আজ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ এবং স্বাধীনচেতা যুবকের অভাব হইয়াছে। সমাজ শরীর পক্ষাঘাতাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে প্রত্যেক গৃহস্থের আশ্রম এক একটা দুর্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রত্যেক গৃহেই হৃষ্টপুষ্ট-বলিষ্ঠ যুবকগণ পরিবারের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত, এবং দস্যু তস্করের ভয় হইতে প্রত্যেকের গৃহ এবং গ্রাম রক্ষা করিতে সক্ষম হইত; পুরমহিলাগণ এতাদৃশ কর্ম্মঠ এবং বীর্য্যশালী পতি পুত্র ভ্রাতা ইত্যাদির সাহায্যে আপনাদিগকে গৌরবান্বিতা বোধ করিতেন। ধর্ম্মরক্ষা, সমাজরক্ষা, ধনরক্ষা, স্ত্রীদিগের সম্মানরক্ষা, এমন কি আত্মরক্ষার ভার পর্য্যন্ত, পরের হাতে তুলিয়া দিয়া, আজ তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল। আত্মরক্ষায় অনভ্যস্ত যুবকগণের স্বাস্থ্য ও চিত্ত নষ্ট হইয়া আকৃতি ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া আসিল। কুল-বধূগণ এতাদৃশ পুরুষ সহবাসে কি লজ্জিতা হন না? ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জাতি সম্মান ইহাদিগের হস্তে ন্যস্ত হইলে কি লাঞ্ছিত হইতে হইবে না?

খর্ব্বাকৃতি সঙ্কুচিতচিত্ত স্বার্থপর মানব সকল, দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ঐ ক্ষুদ্র দেহে যৌবনের জোয়ার, দেখিতে না

দেখিতে, পলকের মধ্যেই বার্দ্ধক্যের ভাটার টানে পলায়ন করিতেছে; শৈশব, কৌমার, যৌবন, জরা, যৌবনের প্রারম্ভেই হায়, শেষ হইয়া যায়! যেন দেবতার অভিশাপে এ জাতির যৌবন অন্তর্ধান করিয়াছে। যেন ব্রহ্মশাপে যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ জরা-বৈক্লব্যযুক্ত দেহে ইহাঁরা কোন্ বীরত্বের অনুষ্ঠান করিবে? কোন্ পুরুষাকারের পরিচয় দিবে? ঐ ক্ষীণ খর্ব্বদেহ তাড়িৎ-সঞ্চালনায় পরিচালিত করিয়া কি ফল ফলিবে? গোষ্পদ, বাড়বানল কি করিয়া ধারণ করিবে?

হায়, ইহাদিগের শম, দম, স্বাস্থ্যসুখ, সবই গেল! শক্তি হারাইয়া ইহারা কি করিয়া বাঁচিয়া আছে? ইহারা জীবিত না মৃত?

অন্নক্লিষ্ট, নিষ্পেষিত অর্দ্ধমৃত জাতি ঐ কালের করাল কবলে প্রবেশ করিতেছে; পিশাচের তাণ্ডব নৃত্যে এবং দারুণ চীৎকারে ভীতি-বিহ্বল-চিত্ত বামনাকৃতি পতঙ্গপ্রাণ মানবসকল ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। কোন আকর্ষনী মন্ত্রবলে এই বধির গড্ডালিকার দুর্নিবার স্রোত প্রতিরুদ্ধ হইবে, সেই সমস্যার সমাধানে সমুৎসুক ব্রাহ্মণযুবক জননী এবং জন্মভূমির বিজয়াশীষ, দেবতার আশীর্ব্বাদ, বৃদ্ধ গুরুজন এবং ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর পদধূলি মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। জীবনের এই অভিনব প্রয়াসে যে কর্ম্মফল ফলিয়া উঠিবে—তাহা দেবতার, যে কোন পুণ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহা ব্রাহ্মণের, যে কোন প্রতিভার বিকাশ হইবে—তাহা পৃথিবীমূর্ত্তি গর্ভধারিণী জননী দেবীর আশীর্ব্বাদ। ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র স্নেহাঞ্চলে টানিয়া, স্বাঙ্কে স্থাপন পূর্ব্বক কোন এক মাহেন্দ্র-মুহূর্ত্তে, যিনি এই দুর্ব্বল শিশুর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, যাঁহার সুবিস্তৃত সুকোমল অঙ্কশয্যায় লক্ষ লক্ষ আর্য্য-শিশু প্রতিদিন ভূমিষ্ঠ হইয়া মা, মা, সম্বোধনে দুঃখার্ত্ত-হৃদয়কে আর্দ্র করিয়া তুলিতেছে, যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অযাচিত দানে এই দেহ-মন্দির

সুনির্ম্মিত এবং সতত সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাঁহারই কল্যাণ-কল্পে দেহাস্থির বিনিপাত হউক ; এই রক্ত-মাংস, মেদ-মজ্জা, জননার সেই উষর বক্ষকে উর্ব্বর করিয়া তুলুক। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার পুণ্যলোক হিতব্রতে বিনিযুক্ত হউক। ব্রাহ্মণ-কণ্ঠে যাহা ধ্বনিত হইবে, তাহাতে তাঁহারই গুণ-গরিমা বিঘোষিত হউক। সেই ব্রহ্মবাণী সমাজের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ পূর্ব্বক এই সুষুপ্ত জনতাকে প্রতিবুদ্ধ করিয়া তুলুক।

কর্ম্মক্ষেত্রে দু'এক পদ অগ্রসর হইয়া স্বধর্ম্ম-সমুত্থান কার্য্যে সতীর্থগণকে আহ্বান করিতে না করিতেই, কে যেন আসিয়া 'ওকি করিতেছ' বলিয়া মুখ চাপিয়া ধরিল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—

"কারে উচ্চৈস্বরে ডাকিতেছি আমি"

এ শ্মশানক্ষেত্রে জন-মানবের সাড়াশব্দ নাই। এ আর্ত্তনাদ কে শ্রবণ করিবে ? কাহাকে ডাকিতেছি ? কেন ডাকিতেছি ? ডাকিবার আমার কি অধিকার ?

অমনি সেই ভীষণ জনশূন্য শ্মশানের গুরু-গম্ভীর নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া প্রতিধ্বনি হইল—

"তুমি ব্রাহ্মণ ?"

আকাশবাণী আকাশ-গর্ভে বিলীন হইতে না হইতেই, হতাশায় হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। রাশি রাশি মর্ম্মভেদী চিন্তা সহস্র বৃশ্চিক দংশন সম যেন এক কালে দংশন করিতে লাগিল—

আমি কিসের ব্রাহ্মণ—তাহ'লে এ শ্মশানে কেন ? পৈশাচিক লীলা খেলায় এ জীবন যৌবন অতিবাহিত হইতেছে কেন ? কোথা সে ব্রহ্মতেজ—

"ব্রহ্ম বীর্য্যতেজ হ'ল অবসান
পিশাচ পেচক করিছে চীৎকার।"

কোথায় আমার সে অপ্রতিহত অধিকার? কোথা সে অগ্নিহোত্রী সতীর্থগণ?—আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া আবার প্রতিধ্বনিত হইল—

"কালগর্ভে"

দেখিলাম, যেন দূর ভবিষ্যের গর্ভে বিপ্লব মগ্না বসুন্ধরা গো-ব্রাহ্মণ-বেদ লইয়া অবস্থান করিতেছে। কাল সমুদ্রের অনন্ত উত্তাল তরঙ্গ-রাশি গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সহাস্যে নৃত্য করিতেছে। সাগর কূলে অতীতের আর্য্যকীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ বিদ্যুৎপুঞ্জ-সমপ্রভ জনৈক পুরুষ দণ্ডায়মান। অঙ্গুলী সঙ্কেতে সেই স্ফটীক-স্বচ্ছ-সলিল-মগ্না বসুন্ধরার কোলে আমার সেই হৃত-সর্ব্বস্ব দেখাইয়া দিল। আমি ভীতি-বিহ্বল চিত্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া অভিবাদন করিতে না করিতেই সেই বিদ্যুল্লেখা মেঘ-মসীতে মিশাইয়া গেল। তাঁহার অদর্শনে আমি কাঁদিয়া উঠিলাম, ও গদ্‌গদ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্, আপনি কে? প্রত্যুত্তর হইল—

"আমি তপঃ—

আমার এক নাম ব্রাহ্মণ, অপর নাম পুরুষকার।" বুঝিলাম, ইনি সেই তপঃ যে, তপস্যার প্রভাবে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের ক্ষাত্রতেজ গ্রাস করিয়াছিলেন। যে তপস্যার প্রভাবে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। যে তপস্যায় ইন্দ্রশত্রু বিনিম্মূল হইয়াছিল। যে তপস্যায় বাসব বিদ্যুদ্বজ্রে-সুশোভিত হইয়াছিলেন—সেই তাপস-বংশ-সম্ভূত—হৃত-সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ আজ পথের ভিখারী, স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর-ধর্ম্ম গ্রহণ তৎপর—পরকে আপন করিতে যাইয়া, হায়, আপন হারাইয়া বসিল। সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া, পরাধীনতার মর্ম্মর-প্রাসাদ ক্রয় করিল। ভবের হাটে ইহাত বড় সহজ বিনিময় নহে। কোটী-কল্পের পুরুষ-পরম্পরার্জ্জিত তপস্যার সহিত অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত বাচালতার বিনিময়—

স্বর্গের সহিত নরকের, মৃত্যুর সহিত অমৃতের বিনিময়। ভারতের হাটে অবলীলাক্রমে কাচ কাঞ্চনে বিনিময় হইয়া গেল। কে জানে ব্রাহ্মণ কি লাভ করিল?